রক্তকমল

অজিত সরকার

করুণা প্রকাশনী
১১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ
১৩৬৮

প্রকাশক :
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
ধনঞ্জয় সামন্ত
মহেন্দ্র প্রেস
৫৮, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু

॥ দাম তিন টাকা ॥

পরমারাধ্য পিতামহ সাহিত্যাচার্য ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকারের

শ্রীচরণ-শরণে

আশিস্‌-প্রার্থী

অজিত

তন্ময় হয়ে পথ দিয়ে চলেছিল তারক। রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। পথে লোক-চলাচল ক'মে গেছে। সুমিত্রার কথা ভাবতে ভাবতে সে চলেছিল—সত্যি কি অদ্ভুত সুমিত্রার কণ্ঠস্বর—কেমন যেন একটা ঘোর এনে দেয়। আচ্ছা, সুমিত্রা কি ওকে...মাথার ভেতর ঝিম্ ঝিম্ কোরে ওঠে—ধমণীতে রক্তের গতি চঞ্চল হয়ে ওঠে!...সুমিত্রা! ...কি মিষ্টি ওর নাম! সু-মিত্রা। হ্যাঁ সুমিত্রাই ওর জীবনের প্রথম সুন্দর বান্ধবী। আর একটু গেলে সে বাড়ী পৌঁছতে পারবে। পায়ের গতি দ্রুত কোরে দিল...দুটো বাড়ী পরেই...

শুনুন।

চিন্তা ভেঙে যায়—তারক চমকে পাশের দিকে তাকায়। দেখে একটি মেয়ে—অন্ধকারে স্পষ্ট কোরে দেখতে পায় না। তারক বলে —আমাকে? হাঁ, বোলে মেয়েটি এগিয়ে আসে। মোড়ের গ্যাসের আলো তার মুখে পড়ে।

তারক প্রশ্ন করে—তুমি?

এই মেয়েটিকে সে বহুবার দেখেছে—বাড়ীর ওপাশে যে বস্তিটা আছে সেইখানেই কোনও একটা ঘরে থাকে। কিন্তু কোনদিন ত মেয়েটি তারকের সঙ্গে কথা বলেনি। তবে আজ কেন হঠাৎ এত রাতে অযাচিত ভাবে তাকে ডাকছে। তারক বিস্ময় বোধ করে।

আমি—মেয়েটি বোলতে পারে না—থেমে যায়।

বলো, কি বোলতে চাও বলো—তারক অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে—একটু বিরক্তিও বোধ করে।

আমাকে বাঁচান—আমাকে বাঁচান—মেয়েটি একেবারে ভেঙে পড়ে।

তারক আশ্চর্য হয়ে যায়, বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—তোমার হয়েছে কি বলো, তা না…

আপনি আমায় এখান থেকে নিয়ে চলুন। এখুনি সবাই আমাকে খুঁজতে আসবে। আপনাকে আমি সব কথা পরে বোলবো।—দারুণ উত্তেজনায় মেয়েটি কাঁদতে থাকে।

কিন্তু,—তারক অসহায়ের মত বলে।

নারীর সব চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাই আজ অপহৃত হতে চলেছে—আপনি…

মুহূর্তে তারক সজাগ হয়ে ওঠে, সবল হাতখানি তার বাড়িয়ে দিয়ে বলে—এস।

অবাক্ হয়ে রামু দরজা খুলে দেয়। দুজনে নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢোকে। মেয়েটিকে চেয়ারে বসিয়ে তারক বলে—এইবার বলো তোমার যা বলবার আছে। জেনো এখানে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ্।

মেয়েটি কাঁদতে থাকে—কিছু বোলতে পারে না। তারক বলে—বেশ। আজ থাক, কাল বোলো। যাও ওঘরে গিয়ে শোওগে যাও।

মেয়েটি বলে—না, না, আপনি শুনুন সব কথা।—জিজ্ঞাসু নেত্রে তারক ওর মুখের দিকে তাকায়—আশ্চর্য ওর জলভরা চোখ দুটি!

বলো।

আমাকে আপনি চেনেন কিনা তা আমি জানিনা, তবে আপনাকে আমি জানি—ভাল ভাবেই জানি। আজ দু'বছর হোলো আমি এখানে এসেছি—আমার মা-বাবা মারা যাবার পর। মেয়েটির চক্ষু

সরল হয়ে ওঠে।—এখানে আমি মামার কাছে থাকি। মামা আর মামী আমায় বেশ ভালই বাসতো, কিন্তু এই কমাস ধরে অভাবের তাড়নায় তারা আমার ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে—আমাকে মামীমা একেবারেই দেখতে পারতো না, আমি তাদের কাছে ভারস্বরূপ হয়ে উঠলাম; তারপর মামীমা একদিন আমার কাছে অতি হীন প্রস্তাব করলো—আমি চমকে উঠলাম—নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করলাম। তারপর...মেয়েটি আর বোলতে পারে না।

বলো, তারপর কি হোলো—তারক প্রশ্ন করে।

তারপর আজ দেখি একজন ভদ্রলোক ঘরে বসে আছে। মামীকে জিজ্ঞাসা করি—ও কে? মামী বলে—'তোর কাছে এসেছে।' আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করি—আমার কাছে?

হাঁ হাঁ, তোর কাছে, তোর জন্যে—কাপড়টা পাল্টে ও ঘরে যা।

কেন?

সেদিন তোকে ত আমি বলেছিলাম।

তুমি বোল্‌ছ কি মামী! মামী আমার কোন ওজরই শুনতে চায় না। আমার ওপর জোর করে, বলে—যাবি না ত খাবি কি? তোকে আমি আর খাওয়াতে পারবো না। তাছাড়া দেখছিস ত সংসারের অবস্থা—ঘরে এককণা চাল নেই। সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে তবে কিছু চাল পাওয়া যায়।

কিন্তু—আমি বলি।

তুই জানিস না, এই ভদ্রলোকের অনেক চাল আছে। মস্ত বড়লোক। আমাদের আর খাওয়া পরার কোন কষ্ট হবে না।

মামীকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে এ হোতে পারে না—এ অন্যায়—এ পাপ। তারপর বুদ্ধি কোরে বহুকষ্টে বাড়ী থেকে বাইরে পালিয়ে আসি, এসে দেখি আপনাকে—আপনি...

যাও, ওঘরে যাও—অনেক রাত হয়েছে—তারক বলে। ব্যাথায় তার সমস্ত অন্তর ভরে ওঠে। মেয়েটি আস্তে আস্তে পাশের ঘরে যায়।

এদিক্‌কার দরজাটা বন্ধ কোরে দাও; আর ঘরের ওপাশে বাথরুম আছে—তারক বলে।

মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে বলে—দরজা দেবার কোনও দরকার নেই।

তবু…

আপনাকেও যদি অবিশ্বাস করি, তাহোলে আর আমি কাকে বিশ্বাস কোরবো বলুন?—তারক আর কোন কথা বলে না, বিছানায় শুয়ে পড়ে।

রাত্রি বেড়ে চলে—তারকের চোখে ঘুম নেই। সে ভাবে—এখন কি কোরবে ওকে নিয়ে। লোকে কি ভাববে। রামু এখন কি ভাবছে, কে জানে।—মেয়েটির ওপর অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে ওর মন। মাকে কাশী পাঠিয়ে বেশ একা ছিল সে—হঠাৎ কোথা থেকে এলো এই আপদ্। ছিঃ ছিঃ! এখন সে কি কোরবে। সুমিত্রা—সুমিত্রা যদি শোনে এ কথা—তাইত!

অসহ্য গরম বোধ করে তারক। সামনের জানলাটা খুলে দেয়। এক ঝলক চাঁদের আলো এসে পড়ে ওর বিছানায়। হঠাৎ মনে পড়ে যায় মেয়েটির সজল দুটি আঁখির কথা। নিমেষে ওর মন মমতায় ভরে ওঠে। সত্যি মেয়েটি বড় হতভাগী! অমন সুন্দর মেয়ে, তার ভাগ্যে কিনা এই নিদারুণ দুর্ভোগ। মেয়েটির যা হোক একটি উপায় কোরতেই হবে। আর শয়তান ঐ ভদ্রবেশধারী বড়লোকগুলো—পরের অভাবের সুযোগ নিয়ে এমন ভাবে সর্বনাশ কোরতে আসে।—বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তারকের সমস্ত মন। সমাজের এই লোকগুলো কি? দেশের আজ এই দারুণ দুর্দিনে এরা নিজেদের কাজ গুছিয়ে চলেছে। উত্তেজনায় সে ঘরের ভেতর পায়চারি কোরতে থাকে। একটু পরে মনে পড়ে যায়, পাশের ঘরে মেয়েটি শুয়ে আছে। হয়ত তার ঘুম ভেঙে যেতে পারে। অশান্ত মনকে সংযত কোরে আবার সে শুয়ে পড়ে, কিন্তু ঘুম তার চোখে আসে না।

শুয়ে শুয়ে সে ভাবে মেয়েটি কি এখন ঘুমিয়ে পড়েছে—না সেও

তার মত জেগে আছে; যদি জেগে থাকে তাহোলে সে এখন কি ভাবছে? সে কি এখন তার কথা ভাবছে; না, না—তা হবে কেন—সে তার নিজের কথাই ভাবছে। ঠুন্ কোরে পাশের ঘর থেকে চুড়ির আওয়াজ আসে। তারক সজাগ হোয়ে ওঠে,—মনে হয় মেয়েটি নিশ্চয়ই জেগে আছে। সে মনে মনে লজ্জা অনুভব করে; মেয়েটি নিশ্চয়ই লক্ষ্য কোরেছে তার এই অস্থিরতা। আচ্ছা, মেয়েটির নাম কি—তাত জিজ্ঞাসা করা হয় নি। যাক, কাল সকালে জিজ্ঞাসা কোরলেই হবে। তারক ঘুমোবার চেষ্টা করে।

অনেক বেলায় তারকের ঘুম ভাঙে। চোখ চেয়ে দেখে অনেক বেলা হোয়ে গেছে, ঘরের মধ্যে বেশ রোদ এসে পড়েছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চম্‌কে ওঠে—তাই ত অনেক বেলা হোয়ে গেছে। দ্রুতবেগে পাশের ঘর অতিক্রম কোরে সে বাথরুমে যায়, একি! তোয়ালে, মাজন, ব্রাশ এমন পরিপাটী কোরে রাখলে কে? আশ্চর্য হোয়ে যায় তারক। আচম্‌কা মনে পড়ে মেয়েটির কথা। হাঁ, তারই কর্ম এ সব। কিন্তু মেয়েটি গেল কোথায়? তাকে ত দেখল না আসবার সময় পাশের ঘরে। তারক তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে নেয়।

বাথরুম থেকে ঘরে এসে তারক অবাক্ হোয়ে যায়।—এর মধ্যে ঘরটা এত সুন্দর কোরে সাজালে কে?—খাটের মশারি তোলা, বিছানা ঝাড়া ঘর ঝাঁট দেওয়া—এমন কি টেবিলের ফুলদানীতে একগুচ্ছ ফুল পর্যন্ত! চেয়ারে বোসে তারক ভাবে—কি ভাবে তা সেই জানে।

একটু পরে মেয়েটি ঘরে ঢোকে জলখাবার আর চা নিয়ে। টেবিলের ওপর সে জলখাবার সাজাতে থাকে, তারক তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। কি অপূর্ব লাগে তারকের চোখে মেয়েটির রূপ—অথচ মেয়েটি শুধু স্নান কোরে তারই একখানা খদ্দরের ধুতি পরেছে; চুলগুলো ওর···

খান—মেয়েটি বলে।

তারকের চমক ভাঙে—মনের মধ্যে একটু লজ্জাও অনুভব করে। সে বলে—চা ত আমি খাইনা।

কেন ?

এম্‌নি।

তবে রান্নাঘরে চা রয়েছে কেন ?

আমার বন্ধুরা এলে খায়। তুমি চা খাও ?

না:..

চা তুমি খাও না ?

হাঁ খেতাম, তবে আর খাব না—মেয়েটি দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

তারক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—তবে এস দুজনে একসঙ্গে এই হালুয়াটুকু খাই।

মেয়েটি অসম্মতি জানায়—তারক জোর করে; মেয়েটি শেষে সম্মত হয়—দুজনে খেতে আরম্ভ করে। খেতে খেতে তারক জিজ্ঞাসা করে—তোমার নাম কি ?

মায়া।

মায়া—তারক আবৃত্তি করে—মায়া! আমার নাম জানতো ? তারক জিজ্ঞাসা করে।

হাঁ।

কি বলো ত।

জানি না—বলেই মেয়েটি ঘর থেকে চলে যায়।

কিছুক্ষণ তারক চুপ করে বসে থাকে, একটু পরে চেয়ার থেকে উঠে আলনা থেকে পাঞ্জাবীটা নিয়ে মাথায় গলিয়ে দেয়। জুতাটা খুঁজে পায় না—কোথায় গেল। এদিক্ ওদিক্ খোঁজে, মায়া ঘরে ঢুকে বলে—কি খুঁজছেন ?

জুতো।

যে চেয়ারে এতক্ষণ তারক বসেছিল তারই তলা থেকে মায়া জুতো জোড়া নিয়ে আসে।

এই নিন। জুতোটা এগিয়ে দিয়ে মায়া প্রশ্ন করে—কোথায় যাচ্ছেন ?

এই আসছি।

জুতো পোরে তারক ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। নীচে নেমে রামুর সঙ্গে তার দেখা হয়। তারকের কেমন সংকোচ হয়। তবু বলে—রামু!

দিদিমণির কাছে আমি সব শুনেছি, ছোটবাবু।

এখন আমি কি করি ? ব্যগ্র হয়ে তারক রামুকে জিজ্ঞাসা করে।

রামু শুধু বলে—আমরা করবার কে ? যিনি করাচ্ছেন, তিনিই সব করেন, ছোটবাবু।

তারক বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তার দুধারে উলঙ্গপ্রায় বুভুক্ষু নর-নারীর ভিড়। তারক সহ্য কোরতে পারে না এ দৃশ্য। সে এগিয়ে যায়। কিন্তু কোথায় যাবে ? চারদিকে—চারদিকে এই নগ্ন রূপ। তারকের কবি-সুলভ হৃদয় ব্যাথায় ভরে ওঠে। ভাবে এরকম হোলো কেন ? উত্তর পায় না। উদ্‌ভ্রান্তের মত সে ঘুরে বেড়ায়, বেলা বেড়ে চলে, তবু তার খেয়াল হয় না। ভুলে যায় সে সব—ভুলে যায় সুমিত্রার কথা—ভুলে যায় মায়ার কথা—ভুলে যায় নিজের খাওয়ার কথা। সে শুধু ভেবে চলে...

ইংরাজী ১৯৪৩ এর প্রথম দিক—বাংলা ১৩৫০ সাল। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাংলা। ঊর্ধ আকাশের দিকে তাকায় তারক। মেঘশূন্য প্রখর দীপ্ত সূর্য। বাংলা জ্বলছে...পুড়ছে...শেষ হোয়ে যাচ্ছে...। তারক কি শুধুই নীরব দ্রষ্টা ! বাংলা তথা ভারতের সব দেশ নেতারা "ভারত ছাড়" আন্দোলনের জন্য কারাগারের অন্তরালে। বাইরের দু'একজন কর্মী যাঁরা আছেন তাঁরাও পলাতক। বাংলার প্রতি তাকাবার জন্য আজ আর কেউ নেই—বাংলাকে অভয় বাণী শোনাবারও কেউ নেই। অসহায় বাংলা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কোরছে...কেন এমন হোলো ? কোথায় গেল বাংলার সে অফুরন্ত ভাণ্ডার ? কোথায় গেল

বাংলার সে শ্যামল রূপ? কাব্য বিলাসী মন তার কঠিন বাস্তবের আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। পথে পথে সে ঘুরে বেড়ায়।

বেলা বেড়ে যায়। মায়ার মনে নানা ভাবনা আসে—কোথায় গেল লোকটি। নিজের ওপর আসে তার গভীর আক্রোশ। হয়ত তারই জন্য...ভাবতে পারে না মায়া। নিজের অক্ষমতার ধিক্কারে সে নিজে জ্বলতে থাকে। ইচ্ছা হয়, এখনই এখান থেকে চলে যেতে। তার জন্য অপর কাউকে দুঃখ দিতে, কষ্ট দিতে সে আর চায় না। কিন্তু সে চলে যেতে পারেও না, ভয় হয়—মানুষের সে যে হিংস্র রূপ দেখেছে তাতে আর তার সাহস হয় না। মানুষের হিংস্র লোলুপ রূপের পরিচয় সে প্রচুর পেয়েছে। এদের কাছে কোন যুক্তি, কোন তর্কই খাটে না। কামনা চরিতার্থ করাই এদের জীবনের বড় কাজ।

গত রাতের কথা মনে পড়লে মায়ার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ওঃ! কি ভীষণ এই ধনীগুলো। নারীর মূল্য এরা টাকা দিয়ে কিনতে চায়! সেও ওই পশুগুলোর কামনার আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যেত...যদি না কাল হঠাৎ তারকের দেখা পেতো। ভগবান্ তারকের মঙ্গল করো। পথের দিকে তাকিয়ে তারকের অপেক্ষায় জানালায় সে বসে থাকে; কিন্তু বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারে না, নীচে নেমে এসে রামুকে জিজ্ঞাসা করে—

রামুদা, তোমার ছোটবাবু ত এখনও এলেন না। বেলা যে অনেক হোয়ে গেল। রামু বলে—

ছোটবাবুর ওমনিই বেলা হয়...তার কি কিছু ঠিক আছে! হয়ত কোন বন্ধুর বাড়ী গল্প করছে কিংবা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বলো কি রামুদা। আশ্চর্য হোয়ে মায়া বলে। রাস্তায় রাস্তায় শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ান?—তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে ব্যাকুলতা স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

এমনি হয় দিদিমণি।—রামু বলে। কিছুই তার খেয়াল থাকে না। তায় আজ আবার রবিবার—ছুটির দিন। আজ হয়ত বাড়ীই আসবে না। বড় খেয়ালী, দিদি,—বড় খেয়ালী!

অনেক বেলায় তারক ফেরে—ঘর্মাক্ত কলেবর—মাথার চুল এলোমেলো। মায়া কিছু বলে না, শুধু পাখা নিয়ে বাতাস করে।

মায়া!—তারক মৃদু কণ্ঠে ডাকে। মায়া ওর মুখের দিকে তাকায়।

কেন এমন হোল? আমি যে আর সহ্য কোরতে পারি না, মায়া! —তারক বলে। মায়া বুঝতে পারে না; সে শুধু তারকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কোথা থেকে এল এই লক্ষ লক্ষ মুমূর্ষু মানব—তারক বলে।— আমি বুঝতে পারিনা কোথায় গেল বাংলার খাদ্য সম্ভার।

ব্যবসায়ীরা লুকিয়ে রেখেছে। মায়া বলে।

না, একা ব্যবসায়ীরা রাখেনি—শুধু তারা দায়ী নয়। আসল যারা দায়ী তারা আছে নেপথ্যে—অলক্ষ্যে থেকে তারা তাদের কাজ কোরে চলেছে। আশ্চর্য লাগে মায়া,—অন্নাভাবে—অনাহারে এরা তিলে তিলে কুঁকড়ে মরছে, তবু এরা তাদের নিজেদের প্রাপ্য কেড়ে নিতে জানে না। অভয় ঘোষের মস্তবড় খাবারের দোকান—থরে থরে সাজানো রয়েছে সুমিষ্ট খাদ্য, অথচ তারই সামনের ফুটপাতে বুভুক্ষুগুলো ক্ষুধার যাতনায় কাৎরাচ্ছে। তারা ভেঙে ফেলতে পারে না—সামান্য ওইটুকু কাচের ব্যবধান! লুঠ কোরতে পারে না ঐ দোকান...কলেজ ষ্ট্রীট মারকেট—বড় বড় দোকানে ঝক্‌ঝকে জিনিষ শোভা পায়। সুদৃশ্য মোটর হতে নামে সুসজ্জিত তরুণ-তরুণী। প্রসাধনের সুগন্ধ ছড়িয়ে ঢুকে যায় দোকানে, ফিরে আসে নানাবিধ দ্রব্য সম্ভার নিয়ে।—তারা একবার তাকিয়েও দেখে না দোকানের সামনের ফুটপাতগুলোর দিকে। এতে আমি সবচেয়ে ব্যথা পাই, মায়া। বিদেশীর কাছে হয়ত এই নগ্ন রুগ্‌ণ রূপ তাদের মনে বিশেষ রেখাপাত কোরতে পারে না, কিন্তু এদেশের ধনী লোকগুলার কি চোখ নেই? তারা কি দেখতে পায় না রাস্তার ধারের এই ক্ষীণ দীর্ণ সত্য রূপ—মানুষের এই দুঃখ-যাতনা? অন্নহীনের এই কাতর আর্তনাদ তাদের কি কানে যায় না! আশ্চর্য! মায়া...তারকের অন্তঃকরণ ব্যাথায় টন্‌টন্ কোরে ওঠে।

আপনি...মায়া মৃদুস্বরে বলে।

—হাঁ, ধনীরা সকল দেশেই সমান।

খাওয়া-দাওয়া কোরে তারক কাগজ কলম নিয়ে বসে—মাকে একখানি চিঠি লিখতে হবে—মায়ার সব কথা জানিয়ে। চিঠির শেষে লেখে—মা, তুমি চলে এস। তুমি না এলে...

একটু ফ্যান দাও মা।—বাইরে থেকে একটি মেয়ে চেঁচায়। তারকের কলম থেমে যায়। নীচে নেমে এসে মায়াকে বলে—মায়া, ঘরে কিছু আছে?

আছে—মায়া বলে।

সবাইকার খাওয়া হয়ে গেছে?—তারক প্রশ্ন করে।

হাঁ।—মায়া থালায় ভাত বাড়তে বাড়তে বলে।

আবার তারক বলে—রামুর খাওয়া হয়েছে; মায়া ঘাড় নেড়ে জানায়—হয়েছে।

তবু তারক প্রশ্ন করে—তোমার? মায়া কিছু বলে না—ভাতের থালা নিয়ে এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

মায়া! তারক ডাকে—

ও আমার অভ্যাস আছে; তাছাড়া এবেলা ত প্রায় কেটেই গেল—দোর খুলতে খুলতে মায়া বলে। তারক কিছু বলবার অবসর পায় না। দোর খুলতেই ঢুকে পড়ে কোলে একটি ছেলে নিয়ে কংকালসার একটি মেয়ে!

এক থালা ভাত দেখে মেয়েটির চোখ লোলুপ হয়ে ওঠে। গোগ্রাসে সে ভাত খেতে থাকে। কোলের ছোট ছেলেটা হাঁ কোরে এগিয়ে আসে ভাত খেতে—মা তাকে অন্য হাতে চেপে ধোরে তাড়াতাড়ি ভাত খেতে থাকে। তারক আর মায়া পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

সন্ধ্যা বেলায় হঠাৎ তারকের খেয়াল হয়—তাইত! আজ বিকালে সুমিত্রার ওখানে তার যাবার কথা ছিল। সুমিত্রা—সুমিত্রার কথা

মনে পড়তেই অনেক কথা তার মনে পড়ে যায়। সুমিত্রার বাড়ীর উদ্দেশে সে বেরিয়ে পড়ে।

তারক সুমিত্রার ঘরে ঢুকে দেখে সুমিত্রা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তারকের আগমন সে টের পায় না। সশব্দে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তারক বসে। শব্দ শুনে সুমিত্রা পিছনের দিকে তাকায়, বলে—

ও, আপনি।

হ্যাঁ! তারক মৃদুকণ্ঠে বলে।

এত দেরী কোরে এলেন?—সুমিত্রা অনুযোগ করে। তারক কিছু বলে না, শুধু একটু হাসে।

সুমিত্রা বলে—আপনার জন্য আমি সেই কখন থেকে অপেক্ষা কোরে রয়েছি—শেষে ভাবলাম হয়ত আপনি ভুলেই গেছেন আমার অনুরোধ—যে ভোলা মন আপনার!

তারক বলে—আপনার অনুরোধ ত আমি রেখেছি, তবে একটু দেরি হয়ে গেছে।

যাক্ ও কথা। আজ আপনাকে কেন আসতে বলেছিলাম জানেন?

না।

আপনার লেখা সেই গানটার আমি সুর দিয়েছি। শুনবেন সুরটা?

হাঁ।—তারক সম্মতি জানায়।

গান থেমে যাবার অনেক পরে তারকের খেয়াল হয় সুমিত্রার কথায়।

কেমন শুনলেন?

অতি সুন্দর। এত ভাল যে আমার কল্পনারও অতীত। আমার গানের যে এত সুন্দর সুর হোতে পারে—এ আমি আশা করিনি। তাছাড়া আপনার কণ্ঠস্বরও অপূর্ব। আপনিই দিলেন আমার বাণীর প্রথম সুর—আপনার কৃপাতেই আমার বাণী মুখর হয়ে উঠলো, আপনি···

বাধা দিয়ে সুমিত্রা বলে—

আমার চেয়ে হয়ত অন্য কেউ আরও ভাল সুর দিতে পারতো।

এ নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক কোরতে চাই না; এইটুকু শুধু বোলবো যে ঠিক এ রকম সুর দিতে কেউ পারবে না। আমি যে ভাবধারার মধ্যে এই গান লিখেছিলাম, ঠিক সেই ভাবের ভেতর দিয়েই আপনি কোরেছেন সুর-সংযোগ। আমার গানের মর্ম আপনি যথার্থ হৃদয়ঙ্গম কোরতে পেরেছেন। কথা শেষ কোরে তারক উঠে পড়ে।

একি! এখুনি উঠছেন যে?

হ্যাঁ—নমস্কার। তারক ঘর থেকে চলে যায়। পথে চলতে চলতে ঐ কথাই ভাবে—সুমিত্রা তার গানে সুর দিয়েছে। জীবনে সে বহু কবিতা, বহু গান লিখেছে, কিন্তু তা কখন ছাপাও হয় নি, আর কেউ কখনও সুর ত দেয়ই নি। সুমিত্রার ওপর কৃতজ্ঞতায় তারকের সারা মন ভরে আসে।

দ্রুতবেগে তারক পথ অতিক্রম করে। পথের মোড় বেঁকতেই মনে পড়ে যায় সে রাত্তিরের কথা—ঠিক এমনি জায়গাতেই মায়ার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়।

পরদিন অফিসে তারক কাজ কোরছিল চুপচাপ। বন্ধু শিবশংকর বলে—কি ব্যাপার—আজ যে একেবারেই মৌন! তারক শুধু হাসে।

কি সুমিত্রার কথা ভাবছিস?

না।

তবে?

এমনি।

তুই এক কাজ কর তারক।

কি? তারক শিবশংকরের মুখের দিকে তাকায়।

তুই সুমিত্রাকে বিয়ে কর।

তা হয় না ভাই! হেসে তারক উত্তর দেয়।

কেন?

সুমিত্রার সঙ্গে আমার অনেক তফাৎ। সে ধনী—আমি গরীব। এ হোতেই পারে না ভাই।

তারক, সুমিত্রা তোকে ভালবাসে।

কিন্তু এ অসম্ভব—তেলে জলে মিশ খায় না।

সে তোকে চায়—এ আমরা বহুরকমে লক্ষ্য কোরেছি।

শিবু, আমি গরীব। তার মত একজন বড়লোকের মেয়েকে এনে রাখবো কোথায় বলতে পারিস?

বড়লোকের মেয়ে হলেও সুমিত্রার কোনও আড়ম্বর নেই। তারক কিছু বলে না—টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাজ আরম্ভ করে।

তারক! —বন্ধু ডাকে।

বল্।

কিছু না। —শিবশংকরও কাজে মন দেয়। মুখ তুলে তারক বলে—জানি, শিবু তুই আমার মঙ্গল চাস, কিন্তু ভাই…

কাজ কর—বড়বাবু আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে তারক বলে—

কিছু বলবেন, স্যার?

না। আপনারা বড্ডো গল্প করেন।

গল্প না করলে আমাদের কাজ এগোয় না, স্যার। বোলেই তারক ঘাড় গুঁজে কাজে মন দেয়।

কদিন পরে কাশী থেকে মার চিঠি আসে মাকে নিয়ে আসবার জন্য। তারক মায়াকে চিঠি দেখায়, বলে—ভাবছি কালই আমি কাশী যাব।

বেশ ত।—মায়া বলে।

দুচার দিন তুমি একলা থাকতে পারবে ত?

হাঁ, তা আমি খুব পারবো। তাছাড়া রামুদা ত থাক্‌বেন। আমার একটুও ভয় করবে না।

কিন্তু খুব সাবধানে থেকো মায়া—তারক বলে।

তারক কাশী চলে যায় এবং দিন চারেক পরে মাকে নিয়ে ফেরে। মা রামুকে জিজ্ঞাসা করেন—রামু, মায়া কৈ?

আজ্ঞে—রামু থেমে যায়। বাড়ীর চারিদিক তারক লক্ষ্য করে, বলে—রামু, মায়া কোথায় গেল?

আজ্ঞে, তিনি চলে গেছেন।

চলে গেছেন! তারক অবাক হয়ে বলে—কোথায় গেছেন, আর কার সঙ্গেই বা গেছেন? তার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ প্রকাশ পায়।

রামু বলে—তাঁর মামা এসে নিয়ে গেছেন। তিনি জানলা দিয়ে দিদিমণিকে দেখতে পেয়েছিলেন।

ওঃ! —তারক নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—মা, তোমার মিছা-মিছিই আসা হোলো।

মা রামুকে জিজ্ঞাসা করেন—তুই তার বাড়ী চিনিস?

হাঁ, মা।

আমাকে একবার সেখানে নিয়ে চল্‌।

সে কি, মা! —তারক তাড়াতাড়ি বলে—সেখানে তুমি যেতে পারবে না, মা। সে চলে গেছে, ভালই হোয়েছে।

না, তারক, আমাকে একবার যেতেই হবে।

বেশ, তবে বিকালে যেও।

রামু, তুই আমায় বিকালেই নিয়ে যাস।

বিকালে তারক জানালার দিকে তাকিয়ে বসেছিল। একটু আগেই রামুকে সঙ্গে নিয়ে মা মায়াদের বাড়ী গেছেন। মায়ের এই ব্যগ্রতা তারক ঠিক বুঝতে পারে না। মায়ার জন্য মায়ের হঠাৎ কেন এই টান। আর হবেই না বা কেন? যতই হোক মায়ের প্রাণ ত—মেয়েটার দুঃখে মা হয় ত সত্যই ব্যথা পেয়েছেন। আচ্ছা, মায়া কি আসবে? তাছাড়া সে আসতে চাইলেও তার মামা কি তাকে আসতে দেবে? —মনের ভেতর তারক প্রশ্নের পর প্রশ্ন কোরে যায়। মায়া এলে সে কি

কোরবে? —আবার ভাবে, মা যখন আছেন, তখন নিশ্চয়ই একটা যাহোক সুব্যবস্থা হবেই। মায়া এখন এলে হয়।

সুমিত্রা পিয়ানোয় বসে আপন মনে তারকের লেখা একটা গানের সুর তুলছিল। শিবশংকর ঘরে ঢুকলো।

আসুন। সুমিত্রা বলে—কেমন আছেন?

ভালই।

তবে এতদিন আসেন নি কেন? একলা আর সময় কাটে না। আপনার বন্ধুর খবর কি?

তারক অফিসে কয়েকদিন ছুটি নিয়ে মাকে আনতে কাশী গেছে।

হঠাৎ? সুমিত্রা বললো।

কি জানি কেন—তবে—না, ঠিক বোলতে পারলাম না। ভাল কথা যে গানটা গাইছিলেন সেটা শেষ করুন।

গানটার সুর এখনও সবটা তোলা হয়নি, হোলে শোনাবো।

কি গান? রবীন্দ্রসঙ্গীত?

না—তারকবাবু লিখেছেন।

তারকের গানে সুর দিচ্ছেন নাকি?

হাঁ।

সত্যি, তারকের কাছে আমি অনেক কিছু আশা করি। —ওর লেখার মধ্যে একটা বিশিষ্টরূপ আছে। আপনাকে আমি বলে দিলাম, ভবিষ্যতে তারক সাহিত্যক্ষেত্রে নাম করবেই।

চলুন শিববাবু, একটু লেকের ধারে ঘুরে আসা যাক্।

চলুন।

ওরা দুজনে মোটরে বেরিয়ে পড়ে।

মায়া রান্নাঘরে কাজ করছিল। দরজা দিয়ে একটি বিধবা স্ত্রীলোক প্রবেশ কোরলো। মহিলাটি প্রশ্ন করেন—

তোমারই নাম মায়া ?

হ্যাঁ।

তোমার মামীমা কোথায় ?

ঘর থেকে মামীমা বেরিয়ে আসে। মামীমা বলে—কোথা থেকে আসছেন ? দে, মায়া, একখানা আসন পেতে দে।

মহিলাটি বলেন—আমি তারকের মা। মায়াকে আমি নিতে এসেছি।

তার মানে ? ভ্রূকুঞ্চিত কোরে মামীমা বলে—আমার মেয়ে আপনার বাড়ী যাবে কেন ?

সেদিন তবে গেছলো কেন ?

সেদিন আমার সঙ্গে একটু ঝগড়া হয়েছিল, তাই রাগের মাথায়। —তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি শুনছিস মায়া। যা, কাজ করগে যা। —মামীমা ঝংকার দিয়ে বলে। দ্রুতপদে মায়া চলে যায়।

মা বলেন—মায়াকে আমার কাছে দিন। আমি নিজের মেয়ের মত কোরে রেখে দেবো।

বিনি পয়সায় বেশ ভাল একটি ঝি পান।

তা নয়, ভাই—ছেলের সঙ্গে আমি মায়ার বিয়ে দেবো।

বিয়ে দেবো বললেই ত আর বিয়ে হয় না। বিয়ে দেওয়ার মত ত আমার এখন সংগতি নেই।

সব খরচ আমি দেবো।

দেখি, তাহলে ওঁকে জিজ্ঞাসা কোরে।

আচম্কা মায়া ঘরে ঢুকে বলে—না জিজ্ঞাসা করতে হবে না। বিয়ে আমি কোরবো না।

মা আশ্চর্য হয়ে বলেন—সে কি মায়া ?

হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা। মায়া ঘর থেকে চলে যায়।

তবে আমি আর কি কোরবো—মামীমা বলে। মা আস্তে আস্তে উঠে চলে যান। অনেক আশা কোরে তিনি এখানে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন, তারকের বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী কোরে আবার কাশী ফিরে যাবেন। একে ত তারক বিয়ে কোরতেই চায় না—তবু মনে হয়েছিল বোধহয় মায়াকে তারক বিয়ে কোরতে রাজি হবে, কিন্তু...

জানলার কাছে মায়া চুপ কোরে বসেছিল। নিস্তব্ধ রাত্রি।

কে? মায়া চমকে ওঠে—জানলার ওপাশে একটা ছায়ামূর্তি।

আমি। চাপাগলায় তারক বলে।

কি চাই?

তুমি চলে এস, মায়া।

না।

আমি তোমায় নিতে এসেছি।

না—আমি যাব না।

ছেলেমানুষী কোরো না, মায়া।—তাড়াতাড়ি চলে এস।

না, আমি যাব না—আপনি চলে যান।

মায়া!—মিনতি কোরে তারক বলে—চলে এস।

কেন যাব বোলতে পারেন?

তোমার সমস্ত ভার আমি নিজে নেবো, মায়া।

তা হয় না। আপনি যান।

কেন?

সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে।

মায়া!

হ্যাঁ!

তবু তুমি এস। স্বেচ্ছায় যে অপরাধ তুমি করনি তার জন্য কেন তুমি শাস্তি নেবে?

না, না, না—বোলছি আমি যাব না। এবার আমি চেঁচাবো বোলছি।—মায়া বলে।

তোমায় না নিয়ে আমি যাব না।

দড়াম কোরে জানলাটা তার মুখের ওপর বন্ধ কোরে দেয়।

অফিসের ছুটির পর কার্জন পার্কে তারক চুপ কোরে বসেছিল। অনেক কিছু সে ভাবছিল—মায়ার কথা, সুমিত্রার কথা, তার মার কথা, নূতন যে উপন্যাসটা লিখতে আরম্ভ কোরেছে তার নায়কের বিশিষ্টতার কথা—আর নিজের কথাও। নানারকম চিন্তা তারকের মনের ভেতর অদ্ভুত রকমে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

তারকদা!

কে? নিজেকে যেন তারক আবার ফিরে পায়।

আমি বিষ্টু। তা এখানে বসে কি কোরছ? চল, মাঠে চল—আজ যে জোর খেলা—মোহনবাগান আর—ছেলেটি তারকের হাত ধরে তুলতে চেষ্টা করে।

না, ভাই, আমি যাব না--তুই যা।

এস, এস—একা একা খেলা দেখতে ভাল লাগে না।

তুই যা আমি যাবো না।

কেন?

এখানে আমি একজনের জন্য অপেক্ষা কোরছি।

ও, তাই বলো। আচ্ছা, তাহোলে আমি চলি, কেমন? টিকিটের জন্য যা ব্যাপার। বিষ্টু চলে যায়।

তারক আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। —এবার তার বিয়ে মা দেবেনই। সত্যি মায়ের এ অনুরোধ আর এড়ানো যায় না। কাশীতে মাকে রেখে আসবার সময় মায়ের ঐ মিনতি তাকে রাখতেই হবে। কিন্তু...

সল্‌টেড বাদাম বাবু--এক আনা প্যাকেট—নেবেন নাকি বাবু?

না। তারক বলে।

নিন না সার—খুব ভাল জিনিষ। লোকটা অনুনয় করে।

না, আমার চাই না, তুমি যাও।

বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না রাখলে কে রাখবে বলুন।

তারক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—নিতাম, ভাই, কিন্তু আমার কাছে ত পয়সা নেই।

তা হোক, আপনি ভদ্রলোক, একটা প্যাকেট নিন—কাল দাম দেবেন।

তা হয় না, ভাই। কাল আমি আসবো কিনা ঠিক নেই।

তা হোক—লোকটি জোর কোরে বলে—আপনি নিন।

না।

আপনাকে নিতেই হবে।

তার মানে? তারক বিরক্ত বোধ করে।

মানে আপনাকে নিতেই হবে।

এবার তারক রেগে গিয়ে বলে—তুমি কি আমার সঙ্গে তামাসা কোরছ?

হ্যাঁ। আরে আমায় তুই চিনতে পারছিস না তারক? তারকের চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা সরে যায়।

সুশীল—কিন্তু…

হাঁ। যাক তাহোলে চিনতে পেরেছিস।

সত্যি ভাই, তোর এই গোঁফ দাড়ী আর এই জামাকাপড়ের মধ্যে আমাদের সেই সৌখীন সুশীলের কোন চিহ্নই নেই। তাছাড়া তুই বাদাম বিক্রি কোরছিস…

আশ্চর্য হবার কিছুই নেই রে ভাই—তুনিয়ায় সবই সম্ভব।

তারক বন্ধুকে পাশে বসিয়ে বলে—বল, এইবার তোর সব কথা খুলে বল।

বলবার কিছুই নেই, ভাই।

বাবার অমতে বিয়ে কোরলাম তাই…

ও বুঝেছি। কিন্তু হঠাৎ বিয়ে কোরতে গেলি কেন? প্রেমে পড়েছিলি বুঝি।

না বিয়ের আগে প্রেমে পড়িনি, তবে এখন পড়েছি।

কথা ঘুরিয়ে সুশীল বলে—আচ্ছা, তারক, আমাদের সেই আগেকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে ?

তা আর মনে পড়ে না—খুব পড়ে। সে সব দিনের কথা কি ভোলবার।

তারকের মনে পড়ে যায় ছাত্রজীবনের কথা। সুশীল কলেজের হোস্টেলে থাকতো ; সে ছিল ভারি আমুদে আর রসিক। সব চেয়ে লক্ষ্য করবার ছিল তার সৌখীনতা। সুশীলের বাবা পাটনায় ওকালতি কোরতেন আর মাসে মাসে সুশীলকে বেশ মোটা রকম টাকা পাঠাতেন। সুশীলই ছিল তারকের ছাত্রজীবনে অন্তরঙ্গ বন্ধু।

ধীরে ধীরে সুশীল বলে—

শোন আমার কথা। পাটনায় একটি মেয়েকে ভালবাসতাম এবং তাকেই বিয়ে কোরবো বলে বাবার কাছে প্রস্তাব করি, কিন্তু বাবা রাজি হোলেন না। তাই···

তাই বাবার অমতেই বিয়ে কোরে ফেললি ?

হাঁ।

কাজটা ত তুই ভালই কোরেছিলি, তবে তোর বাবা রাগ কোরলেন কেন ?

তিনি অন্য জায়গায় আমার বিয়ের সম্বন্ধ কোরে ছিলেন। তাছাড় বন্দনা, আমার স্ত্রী আমাদের স্বজাতীয় নয়।

তোর মা তোর বাবাকে বোঝালেন না কেন ?

আমার নিজের মা অনেক দিন মারা গেছেন। যিনি আছেন তিনি আমার সৎমা।

সুমিত্রা মোটর ড্রাইভ কোরছিল। পাশের সিটে শিবশংকর চুপ কোরে বসেছিল। একটু পরে সুমিত্রা প্রশ্ন করে—কোথায় যাবেন—লেকে ?

না, লেকে আর গিয়ে কি হবে। লেকের সবটাই ত প্রায় মিলিটারীতে নিয়ে নিয়েছে।

তবে? একটা মোড় বেঁকে সুমিত্রা বলে—ময়দানের দিকে চলুন।

রসা রোড দিয়ে গাড়ী দ্রুত ছুটে চলে।

আপনার বাবাকে ত কদিন দেখছি না। কোথাও গেছেন না কি? শিবশংকর প্রশ্ন করে।

হাঁ। দার্জিলিং গেছেন সুটিং তুলতে।

সুমিত্রার পিতা শ্রীযুত মহীতোষ রায় একজন ফ্লিম ডিরেক্টর।

একটু পরে শিবশংকর বলে—একি! এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

তারকবাবুর বাড়ী।

শিবশংকর আর কিছু বলে না—চুপ কোরে বসে থাকে।

তারকের বাড়ী এসে ওরা শোনে তারক এখনও অফিস থেকে ফেরেনি। কখন ফিরবে তারও ঠিক নেই। সুমিত্রা রামুর কাছ থেকে একটু কাগজ চেয়ে নিয়ে শিবশংকরের ফাউনটেন পেন দিয়ে লেখে—

তারকবাবু, কয়েক দিন হোলো আপনার আর দেখাই নেই। কাল বিকালে অবশ্যই আমাদের বাড়ীতে আসবেন।

চিঠিটা রামুকে ওর বাবুকে দিতে বলে ওরা চলে যায়।

বিষ্টু বাড়ী ঢোকে দারুণ উত্তেজনা নিয়ে।

দিদি! দিদি!—বিষ্টু চীৎকার কোরে ডাকে।

কি;—মালতী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

দুগোলে জিতেছে—আমি বোলেছিলাম নিশ্চয়ই জিতবে।

ও আমি শুনেছি—কালুদের বাড়ী রেডিও শুনতে গেছলাম।

তাই নাকি?—বিষ্টু বলে। আমি ভাবলাম আমিই গিয়ে তোমাকে আগে খবরটা দেবো।

মালতী হেসে বলে—যা, হাত-পা ধুয়ে আয়। তোর মোহনবাগান জিতেছে বলে আজ সিঙ্গাড়া ভাজছি।

সত্যি ? বিষ্টুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি কলঘর থেকে মুখ হাত ধুয়ে আসে সে।

দে, খেতে দে। হাঁরে মা কোথায় রে ?—বিষ্টু বলে। বিষ্টুর যখন খুব আমোদ হয় তখন দিদিকে 'তুই' বলে।

মা ঠাকুর ঘরে পূজো কোরছেন।

খেতে খেতে বিষ্টু বোলে যায়—খেলার মাঠের কথা—কে কেমন খেলেছিল—রেফারীর কোথায় অন্যায় হয়েছিল, ইত্যাদি।

রেডিওতে কি সব বোঝা যায়। তাছাড়া ইংরেজী তুই কি সব বুঝতে পারিস ?

খুব বুঝি। তোর চেয়ে আমি ভাল বুঝি।—ভুলে গেলি তারকদার কাছে আমি আগে পড়তাম।

বিষ্টুরা আগে তারকের পাশের বাড়ীতে অনেক দিন ভাড়া ছিল। বছর দুই আগে বাড়ীওলা বাড়ী ছাড়তে নোটীশ দেওয়ায় ওরা এখানে উঠে আসে। ওখানে থাকতে তারকদের সঙ্গে বিষ্টুদের পরিচয় হয়েছিল খুবই নিবিড়।

ভাল কথা, দিদি—বিষ্টু বলে। আজ তারকদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

কোথায় ?

কার্জন পার্কে বসেছিল। বোললাম খেলা দেখতে যেতে। তা গেল না। বোললে একজনের জন্য অপেক্ষা কোরছে।

হাঁরে তারকদা আর কিছু বোললে ?

না, কেমন ধারা যেন গম্ভীর মনে হোলো।

এখানে একদিন আসতে বলেছিস ?

না।

তোকে সেদিন বোললাম যে তারকদার সঙ্গে দেখা হোলে এখানে আসতে বোলবি।

লজ্জিত হয়ে বিষ্টু বলে—তাড়াতাড়িতে ভাই মনে ছিল না।

বস্তীর একটা সরু অন্ধকার নোংরা গলি দিয়ে তারক আর সুশীল চলেছিল, একটা খোলার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সুশীল কড়া নাড়লে। একটু পরে একটি বৌ দরজা খুলে দিল।

একি! আজ এত আগে ফিরলে?—বৌটি বোললো! শরীর ভাল ত? হঠাৎ তারকের দিকে নজর পড়তেই চকিতে ভেতরে ঢুকে গেল।

সুশীল বোললো—আয় ভেতরে আয়। আমার বৌ তোকে দেখে লজ্জা পেয়েছে।

ওরা দুজনে ঘরে ঢুকে বসে। সুশীল বন্দনাকে ডেকে বলে—এর কাছে লজ্জা কোরো না—এ হচ্ছে তারক। তোমাকে বোলেছিলুম না—ছাত্রজীবনে তারকই ছিল আমার একমাত্র বন্ধু।

বন্দনা ঘরে ঢুকতেই তারক উঠে দাঁড়ায়—বলে, আপনার সঙ্গে দেখা কোরতে এলাম।

ব্যস্ত হয়ে বন্দনা বলে—বোসো, ঠাকুরপো বোসো। গরীবের ঘরে হয়ত একটু অসুবিধা হবে।

বৌদি, আমি বড়লোক নই—তারক বলে।

সুশীল বলে—আর তারক ও আমার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সত্যি, এক সময় ওতে আমাতে হরিহর আত্মা ছিলাম বুঝেছ।

হাঁ—বন্দনা সুশীলকে বলে, তারপর তারকের দিকে ফিরে বলে—একটুখানি বোসো, ভাই। আমি তোমাদের জন্য চা কোরে আনি।

তারক বলে—সুশীলের জন্য চা আনুন। চা আমি খাইনা।

কেন?—বন্দনা বলে।

তখন সুশীল বলে—ওহো আমি ভুলে গেছলাম, তারক চা খাওয়া পছন্দ করে না।

তুমি চা খাওয়া পছন্দ কর না? বন্দনা তারককে প্রশ্ন করে।

ওসব কথা থাক—বাধা দিয়ে তারক বলে—বড় জলতেষ্টা পেয়েছে, এক গ্লাস জল আনুন।

বন্দনা অনুযোগ করে—আমি তোমাকে 'ঠাকুরপো', 'তুমি' বোললাম, আর তুমি আমাকে 'আপনি' বোলছ!

তারক অবাক হয়ে যায় বন্দনার সরলতা দেখে—এত তাড়াতাড়ি মানুষকে আপন কোরে নিতে পারে। শুধু তাই নয়—আবার অনুযোগও করে। আশ্চর্য!

আচ্ছা বৌদি, তুমি জল আনো—তারক বলে। বন্দনা জল আনতে যায়।

কেমন দেখলি? সুশীল তারককে জিজ্ঞাসা করে।

তুই জিতেছিস, সুশীল। হেরেছেন তোর বাবা। বোলেই তারক উঠে দাঁড়ায়।

কিরে উঠলি যে?

চললাম, ভাই।

সেকি! জল খেয়ে যা।

বন্দনা জল নিয়ে ঘরে ঢোকে। দাও, জল দাও।—তারক বন্দনার হাত হোতে গ্লাস নিয়ে জল খায়।

আচ্ছা, বৌদি, আজ আমি তাহলে আসি।

এর মধ্যে কেন? একটু পরে যেও।

না। আচ্ছা চলি। তারক ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

কাল তাহলে আসছ ত, ঠাকুরপো।

দেখি।

তারক দ্রুতপদে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাড়ী ফিরে তারক সুমিত্রার চিঠি পায়। সত্যই অনেক দিন সুমিত্রার বাড়ী যাওয়া হয়নি। তাছাড়া যায়নি ভালই কোরেছে—বড়লোকেদের সঙ্গে বেশি মেশামেশি শোভন নয়, শিবশংকরের বাবার টাকা আছে সে পারে। কিন্তু তার বাবার কোন কথাই ত সে জানে না। মাকে জিজ্ঞাসা কোরলে তিনি বিশেষ কিছু বলেন না। নিশ্চয়ই বোলবার মত কিছু নেই। সুমিত্রার ওখানে যায়নি ভালই কোরেছে—

ভবিষ্যতে যাওয়া কমিয়ে দেবে।···অবশ্য সুমিত্রার মধ্যে···একটুও ধনিসুলভ ভাব নেই, তবুও···। ভাবতে ভাবতে কোন্ এক সময়ে তারক ঘুমিয়ে পড়ে। নীচে কড়ানাড়ার শব্দে তারকের ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু তাদের বাড়ী না পাশের বাড়ী তারক ঠিক বুঝতে পারে না।

তারকবাবু আছেন নাকি—ও মশাই।

না—আমাকেই ডাকছে দেখছি। তারক নীচে নেমে আসে।

দরজা খুলতেই ঢুকে পড়ে একটি ভদ্রলোক।

আপনি!—তারক জিজ্ঞাসা করে।

আমি বিশ্বনাথবাবু। মায়া—মায়া কোথায়?

তার মানে? আপনি কি মায়ার মামা?

হাঁ, মায়া কোথায়?

এখানে সে আসেনি।

নিশ্চয়ই এসেছে। বিশ্বনাথবাবু চীৎকার কোরে ওঠেন। তুমিই তাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ।

আপনি বিশ্বাস করুন, মায়া এখানে আসেনি।

আর ন্যাকামো কোরতে হবে না। এখানে আসেনি ত যাবে কোথায়। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে এই সব···

আপনি থামুন। তারক বলে—যান বাড়ী যান।

জানি তুমি সহজে স্বীকার কোরবে না। দাঁড়াও আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি।

এতক্ষণ রামু চুপ কোরে পিছনে দাঁড়িয়েছিল; এইবার সে কথা বলে—হাঁ, যান যান পুলিশের কাছেই যান—বোলেই বিশ্বনাথবাবুকে এক ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বার কোরে দিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ কোরে দেয়।

সারাদিন কেটে যায়, তবু তারক আসেনা, সুমিত্রার মন ব্যাথায় ভরে ওঠে। তারকবাবু কি তার চিঠি পায় নি? কিংবা হয়ত পেয়েছেন —তারপর ভুলেই গেছেন। কি ভোলা মন! তারকবাবু যেন কি!

সুমিত্রা নিজেই মোটর নিয়ে বেরুতে যাবে এমন সময় শিবশংকর এসে হাজির, বলে—কোথায় যাচ্ছেন ?

আসুন।—মোটরের দরজা খুলে দেয় সুমিত্রা।

সুমিত্রার পাশে শিবশংকর বোসে বলে—কতদূর যাবেন ?

অনেক দূর।

তবু ?

তারকবাবুর বাড়ী।

ও। শিবশংকর প্রশ্ন করে—তারক আসেনি ?

না।

কেন বলুন ত ?

কি জানি।

হুহু কোরে বেগে রসা রোডের উপর দিয়ে মোটর চলে। শিবশংকরের মনে কেমন যেন একটা অনুভূতি জাগে। সুমিত্রার চুলের দামী সুগন্ধ তেলের সুবাস ও পায়। সুমিত্রার মাথার সামনের চুলগুলো হাওয়ায় ওড়ে, সুমিত্রার চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি স্টিয়ারিংএ ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সুমিত্রাকে আজ শিবশংকরের বড় ভাল লাগে। সে জানে, সুমিত্রা ভালবাসে তারককে; তবু সুমিত্রার রূপ ওর মনে মোহ বিস্তার করে। সুমিত্রাকে ওর ভাল লাগে কিন্তু তাইবোলে ও সুমিত্রাকে চায় না। সুমিত্রা আর তারকের মধ্যে যদি কোনদিন মিল হয় তা হোলেই শিবশংকর খুশি হবে। কিন্তু তারকটা যেন কি!

মোটর এসে দাঁড়ায় তারকের বাড়ীর সামনে। গাড়ীর আওয়াজ পেয়ে রামু ছুটে আসে। শিবশংকর প্রশ্ন করে—রামু, তোমার ছোটবাবুর খবর কি ? রামু হাউ-হাউ কোরে কেঁদে ফেলে। ওরা দুজনে আশ্চর্য হয়ে যায়। সুমিত্রার বুক আশঙ্কায় দুলে ওঠে; ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছে—অসুখ কোরেছে ?

না। রামু কাঁদতে কাঁদতে বলে। পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, দিদিমণি।...রামু আর বোলতে পারে না।

পুলিশ! তুমি বোলছ কি, রামু? শিবশংকর যেন আকাশ থেকে পড়ে। ধীরে ধীরে রামুর কাছ থেকে ওরা সব কথা শোনে। রামু কাঁদতে কাঁদতে বলে—আপনি বিশ্বাস করুন, শিবশংকরবাবু, আমরা কেউই জানি না মায়া কোথায় গেছে। শিবশংকর কিছু উত্তর দেয় না, তার মন অভিমানে ভরে আসে—এত দিনের এত ব্যাপার অথচ তারক কিছুই বলেনি!

শিবশংকর রামুকে অভয় দেয়; এমন সময় তারক এসে পড়ে।

ছোটবাবু!—রামু প্রায় চীৎকার কোরে ওঠে। শিবশংকর ও সুমিত্রা অবাক্ হয়ে তারকের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

শিবু, সব কথা শুনেছিস ত? তারক বলে। সুমিত্রা দেবী, আপনিও সব শুনেছেন, বোধ হয়।

সুমিত্রা বলে—হাঁ, কিন্তু...

আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পেয়ে ছেড়ে দিলো। তা না হোলে হয়ত—

সুমিত্রা বাধা দিয়ে বলে—ওসব আমরা পরে শুনবো। অনেক বেলা হয়ে গেছে। এখন আপনি—

না, না। তারক সুমিত্রাকে বসতে অনুরোধ করে।

সুমিত্রা বলে—না, এখন আর আমরা বসবো না। সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ী যাবেন, কেমন?

শিবশংকর বলে—তারক, ঠিক মনে থাকে যেন, ভুলে গেলে, ভাই, ভাল হবে না কিন্তু।

নারে, না। আমি ঠিক যাব।

শিবশংকর আর সুমিত্রা মোটরে ওঠে। মোটর ছেড়ে যায় এমন সময় তারক বলে—

আপনার চিঠি আমি পেয়েছিলাম।

তবু ভাল, কথাটা মনে পড়লো। আচ্ছা, যাবেন কিন্তু ঠিক।

মোটর চলে যায়—তারক মোটরের পিছনের নম্বরের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ না সেটা অদৃশ্য হয়ে যায়।

মধ্য কোলকাতার একটা অন্ধকার গলিতে পথ হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে সুশীল চলেছিল। কিছুদূরে গিয়ে আর একটা বাইলেনের মোড়ে এসে সে দাঁড়ায়। পকেট থেকে দেশলাই জ্বেলে দেয়ালে মারা একটা খুব পুরানো বিকৃত প্রায় লেখা পড়ে—কবিরাজ শ্যামসুন্দর রায় রোড। হাঁ, রোড্‌ই বটে। দেড়হাতও হয়ত হবে না চওড়া—সূর্যদেব বোধহয় পঞ্চাশ বছর এর মধ্যে ঢুকতে পারেননি। মনে হয় অনেকদিন আগে এই গলির মধ্যে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিরাজ শ্যামসুন্দর রায়। তাঁর স্মৃতি বোয়ে নিয়ে চলেছে এই পথ। অতবড় কবিরাজের নামের পরে ত আর লেন কিংবা গলি বসানো যায় না। তাই কবিরাজ মহাশয়ের সম্মানার্থ এই ক্ষুদ্র গলিও গৌরবোজ্জ্বল হয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে রোড নামে।

সুশীল পদক্ষেপ গুণতে গুণতে গলির মধ্যে এগোতে থাকে। একে রাত্রি অনেক হয়েছে, তার ওপর এই গলির দুই পাশের বাড়ীগুলোরই এটা পিছন দিক্; তাই কোন আত্মার পাত্তা পাওয়া যায় না। একটা জীর্ণ দরজার সামনে এসে সুশীল দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে সে পাঁচবার দরজার ডান কবাটের ওপর টোকা মারে। দরজার একটা পাট খুলে যায়—একটা বীভৎস, শীর্ণ, একমুখ-দাড়ীওলা লোক সুশীলের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। সুশীল নিঃশব্দে একটা গোল চাক্‌তি দেখায়; লোকটা দেশলাই জ্বেলে চাক্‌তিটা ভাল কোরে পরীক্ষা করে।

লোকটা সুশীলকে বলে—সোজা গিয়ে বাঁহাতি সিঁড়ি—ওপরে চলে যান। সুশীল অন্ধকারে হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে।

কে?—সামনের ঘর থেকে শব্দ আসে।

মানুষ—সুশীল বলে।

এস, ঘরে এস।

একটা আবছা অন্ধকার ঘরে এসে সুশীল ঢোকে। ঘরের ভেতর

আট-দশ জন পুরুষ ও মহিলা গোল হয়ে বোসে আছে। সুশীল ওদের সংখ্যা বাড়ায়।

তাহোলে সবাই এসে গেছে?—এক জন বলে। হাঁ, বড়দা।—অন্য একজন উত্তর দেয়। বড়দা বলেন—

তোমরা সবাই জানো আমাদের বিপদের অবস্থা। কর্তারা আমাদের ওপর ভীষণ নজর রেখেছেন, তাই আমাদের আপিস পাল্‌টাতে হয়েছে। আমি খবর পেয়েছি, আমাদের পূর্বেকার আপিসে আজই খানাতল্লাসী হবে। উপস্থিত আমরা এই বাড়ী থেকে কাজ করবো।

বন্ধুগণ, আমাদের বিপদ যত বেড়ে যাচ্ছে কাজের গুরুত্বও তেমনি বেড়ে চলেছে। এখন আমাদের খুব সতর্ক হয়ে কাজ কোরতে হবে। যে কথাটা তোমাদের বার বার বোলেছি সেই কথাটাই তোমাদের আবার বোলছি যে, শুধু সাময়িক খেয়ালের বসে যারা এখানে এসেছ, তারা চলে যাও। আমাদের দলে এলে মর্মে মর্মে উপলব্ধি কোরতে হবে—মায়ের দুঃখের কথা। যত দিন না মায়ের দুঃখ মোচন কোরতে পারবো, ততদিন আর আমাদের অন্য কোন চিন্তা নেই। এর জন্য আমাদের অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার কোরতে হবে।

তোমরা শীলাকে চেনো—যে শীলা কিছু দিন আগে আমাদের দল থেকে বিদায় নিয়েছে। উপস্থিত এক বিশিষ্ট পুলিশ অফিসারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, তাতে আমরা দুঃখিত নই।

কিছুক্ষণ থেমে বড়দা আবার বলেন

আমাদের অধিকাংশ কথাই সে বোলে দিয়েছে—অবশ্য যতটুকু সে জানতো। এই হচ্ছে আমাদের বাড়ী পাল্‌টানোর কারণ।

পাশ থেকে একটি মেয়ে বলে—

বড়দা, শীলার ভার আমার ওপর দাও।

বেশ।—বড়দা বলেন। তুমি যা উপযুক্ত বিবেচনা কোরবে শীলার বিষয় তাই কোরবে। রেবা, তোমার ওপর আমি দিলাম পূর্ণ ক্ষমতা।

আমি তাহোলে আসি, বড়দা। রেবা বলে।

হাঁ, এসো।

রেবা ঘর থেকে চলে যায়।

সুশীল!—বড়দা বলেন। তোমাকে কাল যেতে হবে রাজগ্রাম, যেখানে সুরথ আছে। তুমি সম্পূর্ণভাবে সুরথের সহযোগিতা কোরবে। আর তোমরা উপস্থিত যা কোরছো তাই কোরে যাও। তাহলে আজকের মত আমাদের অধিবেশন এই খানেই শেষ করা যাক।

খুট কোরে একটা শব্দ হোলো। সুমিত্রা তাকিয়ে দেখে সামনে তারক দাঁড়িয়ে।

অসময়ে এসে ধ্যান ভঙ্গ কোরলাম দেখছি। তারক বলে। ধ্যান-ভঙ্গ হয়নি, তারকবাবু, ধ্যান সম্পূর্ণ হয়েছে। সুমিত্রা বলে।

কি রকম?

আপনার কথাই ভাবছিলাম। থাক, ওসব কথা। আপনি আচ্ছা লোক ত?

কেন?

বোসতে বলিনি বোলে কি বোসবেন না; না কি?

স্মিত আনন্দে তারক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। সুমিত্রা বলে—

তারপর, তারকবাবু, হঠাৎ কি মনে কোরে?

কেন? আসতে নেই নাকি?

আসতে যদি থাকবে তবে এত দিন আসেন নি কেন?

যদি বলি কাজ ছিল?

বিশ্বাস কোরবো না।

তাহলে…

আমি বলবো কেন আসেন নি?

বলুন।

আপনার খেয়াল ছিল না—মানে মনে ছিল না। তাই না?

তা…তা…

বাধা দিয়ে সুমিত্রা বলে—ওসব কথা যেতে দিন। ভাল কথা, আপনার উপন্যাসখানা শেষ হয়েছে ?

হাঁ, শেষ হয়েছে। আর সেই জন্যই ত আমি আসতে পারিনি।

চলুন, আপনার বাড়ী গিয়ে উপন্যাসটার পাণ্ডুলিপিখানা নিয়ে আসি।

তা—হঠাৎ—এখুনি ?

বাবা একখানা ছবি তোলবার জন্য নোতুন আইডিয়ার আপ-টু-ডেট্ প্লট খুঁজছেন। আপনার বইখানার মধ্যে নিশ্চয়ই তিনি নোতুন কিছু পাবেন।

কিন্তু…

আসুন। গেট আপ, প্লিজ, ইয়ং আর্টিস্ট !

ছোটবাবু!—ব্যস্তভাবে রামু ঘরে ঢোকে, কিরে, রামু? তারক জিজ্ঞাসা করে।

টেলিগ্রাম, ছোটবাবু। রামু খামখানা তারকের দিকে এগিয়ে দেয়। তারক খামখানা ছিঁড়ে টেলিগ্রাম পড়তে থাকে।

কি খবর, তারকবাবু ? ব্যগ্র হয়ে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করে।

মার অসুখ—এখুনি যেতে হবে। আচ্ছা তাহলে আজ আসি সুমিত্রা দেবী। পাণ্ডুলিপিটা আমি রামুর হাতে পাঠিয়ে দেবো, কেমন ?

তাই দেবেন, আর পৌঁছেই চিঠি দেবেন, বুঝেছেন।

আচ্ছা। দ্রুতপদে রামুর সঙ্গে তারক ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রাত্রি তখন অনেক হবে। চারদিক্ বেশ নিঝুম হয়ে এসেছে। কিসের একটা শব্দ হয়। ধড়মড় কোরে শীলা বিছানায় উঠে বসে।

কে ?

আমি।

রেবা ?

হাঁ।

তুমি এই দোতালার ঘরে কি কোরে এলে ?

যেমন কোরেই হোক আমি এসেছি।

শীলা একটু থেমে বলে—এত রাত্রে তোমার কিসের প্রয়োজন।

প্রয়োজন একটু আছে বৈকি।—রেবা বেশ ধীর ভাবে বলে।

ওঃ। শীলা বলে—তাহোলে বসো।

বোসতে আমি আসিনি। তাছাড়া বসবার আমার সময় নেই। শীলা একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা কোরবো—যে পাপ, যে অন্যায় তুমি কোরেছ তার জন্য শাস্তি নিতে তুমি প্রস্তুত কি-না ?

তুমি কি বোলছ ?

তোমার স্বামী কোথায়।

তা আমি ঠিক জানি না।

আমি জানি—রেবা বলে। তিনি এখন আমাদের আপিস খানাতল্লাস কোরতে গেছেন। এর জন্য দায়ী তুমি।

আমায় বিশ্বাস করো, আমি—

সাট্‌আপ। তোমার কোন কথা শুনতে চাইনা। ফার্স্ট্ বি রেডি, প্লিজ।

রেবা!

ইয়েস্, ইট ইজ মাই ডিউটি। কান্‌ট্ হেল্‌প্।

আমি আমার অপরাধ স্বীকার কোরছি। ক্ষমা করো।

আমি ক্ষমা করবার কে ? বিশ্বাস-ঘাতকের মৃত্যুই একমাত্র ক্ষমা।

কিন্তু তুমি ত জানো, কেন আমাকে এসব কথা বোলতে হয়েছে।

আমি কোন কথাই শুনতে চাই না।

নীচে মোটর আসার শব্দ শোনা যায়। রেবা দৃঢ়কণ্ঠে বলে—

শীলা তোমার স্বামী এসে গেলেন। ভগবানের নাম স্মরণ করো।

রেবা বুকের ভেতর থেকে রিভলবার বার করে।

রেবা! রেবা!

—মেঝের ওপর সশব্দে পড়ে যায় শীলা।

ভগবান্ তোমার আত্মার কল্যাণ করুন!—তড়িৎপদে জানলা দিয়ে রেবা অদৃশ্য হয়ে যায়।

কাশীর গঙ্গার তীরে একটি ছোট বাড়ী। কেমন যেন একটা রহস্যময় থমথমে ভাব ঘিরে রয়েছে এই বাড়ীটিকে। একটা ঘরের স্বল্প আলোকে খাটের ওপর মৃত্যুপথযাত্রী মা শুয়ে রয়েছেন। আর মার কাছে শুষ্কমুখে বসে আছে তারক। ঘরের নিস্তব্ধতা ভেদ কোরে মা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলেন—তারক! ঝুঁকে পড়ে তারক বলে—মা! মা বলেন—

তারক, আমি চলে যাচ্ছি, তবে যাবার আগে একটা কথা তোকে বলে যাই যে, পৃথিবীটা মাটির। মাটির পৃথিবীতে চলতে গিয়ে আকাশের কথা ভাবলে চলবে না। তুই আদর্শবাদী, কল্পনা বিলাসী, কিন্তু তোর মত সকলে নয়। জগতের এই পথে কোথাও পেছল, কোথাও কাঁটা, কোথাও খাত—এখানে পদে পদে বিপদ্। একটু সাবধানে পথ চলিস, বাবা। এই পথে চলতে গেলে কত সময় হয় ভুল, কত সময় মনে আসে হতাশা। ভুলের সংশোধনের জন্য, হতাশায় উৎসাহের জন্য নিতান্ত আবশ্যক একজন সাথীর। জীবনে তোকে আমি সংসারী কোরতে পারলাম না। পরলোকে গিয়েও যদি আমি দেখি তোর এই খাপছাড়া উদাসীন ভাব, তা হোলে সেখানে গিয়েও আমি শান্তি পাব না।

তারক বলে—তুমি ভাল হয়ে ওঠো, মা। আমি বিয়ে কোরবো।

ম্লান হাসি হেসে মা বলেন—ভাল আর আমি হবো না। তবে তুই সংসারী হবি শুনলাম—মৃত্যুকালে এই আমার পরম সান্ত্বনা।

তুমি ভাল হয়ে যাবে, মা।

মিথ্যে তুই আমায় আর আশ্বাস দিস না, তারক। যাবার আগে তোর কাছে আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে যেতে চাই।

তুমি কি বোলছ, মা!

হ্যাঁ, বাবা। এতদিন তোর পিতৃ পরিচয় যা দিয়ে এসেছি তা একেবারে মিথ্যে। তোর বাবা সামান্য স্কুল মাষ্টার ছিলেন না—তিনি ছিলেন মস্তবড় জমিদার।

মা?

ব্যস্ত হসনি, সব কথা আমি তোকে বোলছি।—অতি গরীবের ঘর থেকে তিনি পিতৃমাতৃহীন আমাকে নিয়ে এসে তাঁর পায়ে স্থান দিয়েছিলেন। সংসার ছিল আমাদের অতি সুখের, কিন্তু সে সুখ আর বেশিদিন অদৃষ্টে সইলো না। তোর যখন দুবছর বয়স তখন অকস্মাৎ তিনি সামান্য দুদিনের জ্বরে পরলোকে চলে যান।

মার কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে ওঠে। ক্ষণেক থেমে তিনি পুনরায় বোলতে থাকেন—

তারপর থেকে আমার আরম্ভ হোলো দুঃখের জীবন। আমার ছোট যা, মানে তোমার কাকীমার—কেন জানি না, শিশু তুই আর আমি বিষ নজরে পড়লাম। যখন তখন সে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কোরতে লাগলো। কেন যে, তা আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। হঠাৎ একদিন আমি বুঝতে পারলাম এর কারণ—সম্পত্তির অর্ধেকের উত্তরাধিকারী তুই হোচ্ছিস যত নষ্টের মূল। ঠাকুরপোকে একদিন বোললাম যে, ঠাকুরপো, তোমার বৌ আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না। উত্তরে ঠাকুরপো বোললেন যে, এক হাতে তালি বাজে না, বৌদি। সে দিন বুঝলাম, এ বাড়ীতে আমার কেউ আপন জন নেই।

আমার ভয় হোতে লাগলো যদি তোর কোন বিপদ্ হয়। আমার মনে হোতে লাগলো তোর দিকে সারা বাড়ীটা কেমন যেন একটা রহস্যময় ভাবে তাকিয়ে রয়েছে। আমার মনে হোলো এ বাড়ীতে থাকলে তোকে আমি বাঁচাতে পারবো না। তাই সম্পত্তির মায়া ত্যাগ

কোরে, শুধু তোকে বাঁচানোর জন্য, ভগবানের নাম কোরে, নিজের গয়না আর হাতে যা টাকা ছিল তাই নিয়ে—আমার একমাত্র সম্বল তোকে বুকে চেপে ধরে, একদিন অন্ধকার রাতে বাড়ী ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ি। তারপর কত দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে তোকে যে আমি মানুষ কোরেছিলাম তার খানিকটা ত তুই জানিস, বাবা।

তারক বলে—তুমি আমায় কি কোরতে বলো।

মা বলেন—আমার মৃত্যুর পর তুই সেখানে যাবি তোর ন্যায্য অধিকার আদায় কোরতে।

কিন্তু আমায় তারা দেবে কেন?

দেবে। ঐ বাক্সর মধ্যে আছে বহু প্রমাণ—চিঠি, কাগজ, ছবি, দলিল—অনেক কিছু আছে। ঐ বাক্সর ভেতরই আছে তোমার প্রকৃত পরিচয়।

কিন্তু দরকার কি, মা, সম্পত্তিতে। আমার ত কোন অভাব নেই।

সম্পত্তির হয়ত দরকার নেই, কিন্তু তোমার সত্য পরিচয়ের আছে প্রকৃত প্রয়োজন। এই সত্য পরিচয় থেকে আমি যদি তোমাকে বঞ্চিত কোরে যাই তাহোলে পরলোকে গিয়ে তাঁর কাছে আমি কেমন কোরে মুখ দেখাবো?

আমার সত্য পরিচয় এখনত আমি পেয়েছি।

তুমি পেলেও জগৎ তা পায়নি। জগতের কাছে তুমি চিরদিনই মিথ্যা পরিচয়েই থাকবে, তা হয় না।

এতে ক্ষতি কি, মা?

লাভ-ক্ষতির কথা নয়, বাবা। তোমার জন্মগত অধিকার যদি অস্বীকার করো, তবে বুঝবো তোমার পৌরুষত্ব নেই।

আমি বিবাদ-বিসংবাদ চাই না, মা।

ওগুলো দুর্বলতার কথা। পৃথিবীতে থাকতে গেলে বিপদ্-আপদের কাছে নীরবে পরাজয় স্বীকার না কোরে যে তার সঙ্গে সত্যের জন্য, নিজের জন্মগত দাবীর জন্য সংগ্রাম করে, সেই মানুষ।

তারকের মুখ সহসা স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে ভাঙা গলায় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—

তুমি আমায় আশীর্বাদ করো, যেন তোমার আশীর্বাদে আমি কখনও দুর্বল হয়ে না পড়ি। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, নিজের জন্মগত অধিকার লাভের জন্য আমি যেন আত্মবলি দিতে কুণ্ঠিত না হই।

মা নীরবে তারকের মাথায় হাত বুলোতে থাকেন। চোখ দিয়ে তাঁর গড়িয়ে পড়ে মুক্তার ন্যায় আনন্দাশ্রু।

নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় তারক অলসভাবে একখানা কম্বলের ওপর শুয়ে ছিল।

তারকদা?

কে মালতী?

হ্যাঁ, কিন্তু তোমার এ রকম বেশ কেন? কি হয়েছে?

মা মারা গেছেন।

মা মারা গেছেন!—মালতী কেঁদে ফেলে।—অথচ তুমি আমার একটা খবরও দাওনি।

কি কোরে খবর দেবো বলো। হঠাৎ কাশী থেকে টেলিগ্রাম এলো—মার অসুখ। তখনই চলে গেলাম। তারপর সেইখানেই তিনি মারা যান।

ওঃ।

আজই আমি কাশী থেকে ফিরেছি। যাক আমার কথা। তুমি হঠাৎ কি মনে কোরে?

তোমার খোঁজ নিতে। তুমি ত আমাদের দরকার মনে করো না। তবে আমরা তা মনে করি, তাই...

শুনে সুখী হোলাম, মালতী, আজও যে তোমরা আমাকে মনে রেখেছ এর জন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শুধু ধন্যবাদই, তারকদা ?

তাছাড়া আর কি চাও, মালতী ? তুমি আর তোমার বাড়ীর সকলেই আমার মঙ্গল চাও—তা কি আমি বুঝি না, মনে করো ? তোমরা আমায় স্নেহ করো। ভালবাসো তা আমি জানি। তবে এ সবের প্রতিদানে আমি তোমাদের কিছুই দিইনি তাও আমি স্বীকার কোরছি।

না, তারকদা। তুমিও আমাদের অনেক কিছু দিয়েছ। মনে নেই, সেই যখন আমরা তোমার পাশের বাড়ীতে ভাড়া থাকতাম, তখন তুমি বিনা পারিশ্রমিকে আমাকে আর বিষ্টুকে পড়াতে। সময়ে অসময়ে আমাদের কত কাজ কোরে দিতে। তাই আজ আমি তোমার কাছে শুধু ধন্যবাদ পাবার জন্য আসিনি—এসেছিলাম আর একটা কাজের প্রত্যাশায়।

তারক বলে—এসেছিলাম বোলছ কেন ? তুমি কি এখনই চলে যাচ্ছ ?

হ্যাঁ।

কিসের প্রত্যাশায় তুমি আমার কাছে এসেছিলে, তাতো তুমি বোললে না ?

সে কথা এখন বলা আমার সাজে না কারণ এখন তুমি শুধু ধন্যবাদ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারো না। তাছাড়া মার মৃত্যুর জন্য তুমি শোকাতুর। এ সময়ে নিজের সুবিধার জন্য তোমাকে বিরক্ত করা আমার উচিতও নয়।

তা হয় না, মালতী। বোলতে যখন তুমি এসেছ, তখন তোমাকে বোলতেই হবে ! তারপর তা করা না করা আমার বিবেকের ওপর নির্ভর কোরবে। তুমি বলো।

আমি এখানে আসার আগে জানতাম না যে তোমার এই অবস্থা হয়েছে।—তোমার ওপর দিয়ে কত বড় ঝড় চলে গেছে।

তবু তোমাকে বোলতে হবে।

রেবা ?

হাঁ।

তুমি এই দোতালার ঘরে কি কোরে এলে ?

যেমন কোরেই হোক আমি এসেছি।

শীলা একটু থেমে বলে—এত রাত্রে তোমার কিসের প্রয়োজন।

প্রয়োজন একটু আছে বৈকি।—রেবা বেশ ধীর ভাবে বলে।

ওঃ। শীলা বলে—তাহোলে বসো।

বোসতে আমি আসিনি। তাছাড়া বসবার আমার সময় নেই। শীলা একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা কোরবো—যে পাপ, যে অন্যায় তুমি কোরেছ তার জন্য শাস্তি নিতে তুমি প্রস্তুত কি-না ?

তুমি কি বোলছ ?

তোমার স্বামী কোথায়।

তা আমি ঠিক জানি না।

আমি জানি—রেবা বলে। তিনি এখন আমাদের আপিস খানাতল্লাস কোরতে গেছেন। এর জন্য দায়ী তুমি।

আমায় বিশ্বাস করো, আমি—

সাট্‌আপ। তোমার কোন কথা শুনতে চাইনা। ফাস্ট্ বি রেডি, প্লিজ।

রেবা !

ইয়েস্, ইট ইজ মাই ডিউটি। কান্‌ট্ হেল্‌প্।

আমি আমার অপরাধ স্বীকার কোরছি। ক্ষমা করো।

আমি ক্ষমা করবার কে ? বিশ্বাস-ঘাতকের মৃত্যুই একমাত্র ক্ষমা।

কিন্তু তুমি ত জানো, কেন আমাকে এসব কথা বোলতে হয়েছে।

আমি কোন কথাই শুনতে চাই না।

নীচে মোটর আসার শব্দ শোনা যায়। রেবা দৃঢ়কণ্ঠে বলে—

শীলা তোমার স্বামী এসে গেলেন। ভগবানের নাম স্মরণ করো।

রেবা বুকের ভেতর থেকে রিভলবার বার করে।

রেবা ! রেবা !

—মেঝের ওপর সশব্দে পড়ে যায় শীলা।

ভগবান্ তোমার আত্মার কল্যাণ করুন !—তড়িৎপদে জানলা দিয়ে রেবা অদৃশ্য হয়ে যায়।

কাশীর গঙ্গার তীরে একটি ছোট বাড়ী। কেমন যেন একটা রহস্যময় থমথমে ভাব ঘিরে রয়েছে এই বাড়ীটিকে। একটা ঘরের স্বল্প আলোকে খাটের ওপর মৃত্যুপথযাত্রী মা শুয়ে রয়েছেন। আর মার কাছে শুষ্কমুখে বসে আছে তারক। ঘরের নিস্তব্ধতা ভেদ কোরে মা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলেন—তারক! ঝুঁকে পড়ে তারক বলে—মা! মা বলেন—

তারক, আমি চলে যাচ্ছি, তবে যাবার আগে একটা কথা তোকে বলে যাই যে, পৃথিবীটা মাটির। মাটির পৃথিবীতে চলতে গিয়ে আকাশের কথা ভাবলে চলবে না। তুই আদর্শবাদী, কল্পনা বিলাসী, কিন্তু তোর মত সকলে নয়। জগতের এই পথে কোথাও পেছল, কোথাও কাঁটা, কোথাও খাত—এখানে পদে পদে বিপদ্। একটু সাবধানে পথ চলিস, বাবা। এই পথে চলতে গেলে কত সময় হয় ভুল, কত সময় মনে আসে হতাশা। ভুলের সংশোধনের জন্য, হতাশায় উৎসাহের জন্য নিতান্ত আবশ্যক একজন সাথীর। জীবনে তোকে আমি সংসারী কোরতে পারলাম না। পরলোকে গিয়েও যদি আমি দেখি তোর এই খাপছাড়া উদাসীন ভাব, তা হোলে সেখানে গিয়েও আমি শান্তি পাব না।

তারক বলে—তুমি ভাল হয়ে ওঠো, মা। আমি বিয়ে কোরবো।

ম্লান হাসি হেসে মা বলেন—ভাল আর আমি হবো না। তবে তুই সংসারী হবি শুনলাম—মৃত্যুকালে এই আমার পরম সান্ত্বনা।

তুমি ভাল হয়ে যাবে, মা।

মিথ্যে তুই আমায় আর আশ্বাস দিস না, তারক। যাবার আগে তোর কাছে আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে যেতে চাই।

তুমি কি বোলছ, মা!

হ্যাঁ, বাবা। এতদিন তোর পিতৃ পরিচয় যা দিয়ে এসেছি তা একেবারে মিথ্যে। তোর বাবা সামান্য স্কুল মাষ্টার ছিলেন না—তিনি ছিলেন মস্তবড় জমিদার।

মা-?

ব্যস্ত হসনি, সব কথা আমি তোকে বোলছি।—অতি গরীবের ঘর থেকে তিনি পিতৃমাতৃহীন আমাকে নিয়ে এসে তাঁর পায়ে স্থান দিয়েছিলেন। সংসার ছিল আমাদের অতি সুখের, কিন্তু সে সুখ আর বেশিদিন অদৃষ্টে সইলো না। তোর যখন দুবছর বয়স তখন অকস্মাৎ তিনি সামান্য দুদিনের জ্বরে পরলোকে চলে যান।

মার কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে ওঠে। ক্ষণেক থেমে তিনি পুনরায় বোলতে থাকেন—

তারপর থেকে আমার আরম্ভ হোলো দুঃখের জীবন। আমার ছোট যা, মানে তোমার কাকীমার—কেন জানি না, শিশু তুই আর আমি বিষ নজরে পড়লাম। যখন তখন সে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কোরতে লাগলো। কেন যে, তা আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। হঠাৎ একদিন আমি বুঝতে পারলাম এর কারণ—সম্পত্তির অর্ধেকের উত্তরাধিকারী তুই হোচ্ছিস যত নষ্টের মূল। ঠাকুরপোকে একদিন বোললাম যে, ঠাকুরপো, তোমার বৌ আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না। উত্তরে ঠাকুরপো বোললেন যে, এক হাতে তালি বাজে না, বৌদি। সে দিন বুঝলাম, এ বাড়ীতে আমার কেউ আপন জন নেই।

আমার ভয় হোতে লাগলো যদি তোর কোন বিপদ্ হয়। আমার মনে হোতে লাগলো তোর দিকে সারা বাড়ীটা কেমন যেন একটা রহস্যময় ভাবে তাকিয়ে রয়েছে। আমার মনে হোলো এ বাড়ীতে থাকলে তোকে আমি বাঁচাতে পারবো না। তাই সম্পত্তির মায়া ত্যাগ

কোরে, শুধু তোকে বাঁচানোর জন্য, ভগবানের নাম কোরে, নিজের গয়না আর হাতে যা টাকা ছিল তাই নিয়ে—আমার একমাত্র সম্বল তোকে বুকে চেপে ধরে, একদিন অন্ধকার রাতে বাড়ী ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ি। তারপর কত দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে তোকে যে আমি মানুষ কোরেছিলাম তার খানিকটা ত তুই জানিস, বাবা।

তারক বলে—তুমি আমায় কি কোরতে বলো।

মা বলেন—আমার মৃত্যুর পর তুই সেখানে যাবি তোঁর ন্যায্য অধিকার আদায় কোরতে।

কিন্তু আমায় তারা দেবে কেন?

দেবে। ঐ বাক্সর মধ্যে আছে বহু প্রমাণ—চিঠি, কাগজ, ছবি, দলিল—অনেক কিছু আছে। ঐ বাক্সর ভেতরই আছে তোমার প্রকৃত পরিচয়।

কিন্তু দরকার কি, মা, সম্পত্তিতে। আমার ত কোন অভাব নেই।

সম্পত্তির হয়ত দরকার নেই, কিন্তু তোমার সত্য পরিচয়ের আছে প্রকৃত প্রয়োজন। এই সত্য পরিচয় থেকে আমি যদি তোমাকে বঞ্চিত কোরে যাই তাহোলে পরলোকে গিয়ে তাঁর কাছে আমি কেমন কোরে মুখ দেখাবো?

আমার সত্য পরিচয় এখনত আমি পেয়েছি।

তুমি পেলেও জগৎ তা পায়নি। জগতের কাছে তুমি চিরদিনই মিথ্যা পরিচয়েই থাকবে, তা হয় না।

এতে ক্ষতি কি, মা?

লাভ-ক্ষতির কথা নয়, বাবা। তোমার জন্মগত অধিকার যদি অস্বীকার করো, তবে বুঝবো তোমার পৌরুষত্ব নেই।

আমি বিবাদ-বিসংবাদ চাই না, মা।

ওগুলো দুর্বলতার কথা। পৃথিবীতে থাকতে গেলে বিপদ্-আপদের কাছে নীরবে পরাজয় স্বীকার না কোরে যে তার সঙ্গে সত্যের জন্য, নিজের জন্মগত দাবীর জন্য সংগ্রাম করে, সেই মানুষ।

তারকের মুখ সহসা স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে ভাঙা গলায় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—

তুমি আমায় আশীর্বাদ করো, যেন তোমার আশীর্বাদে আমি কখনও দুর্বল হয়ে না পড়ি। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, নিজের জন্মগত অধিকার লাভের জন্য আমি যেন আত্মবলি দিতে কুণ্ঠিত না হই।

মা নীরবে তারকের মাথায় হাত বুলোতে থাকেন। চোখ দিয়ে তাঁর গড়িয়ে পড়ে মুক্তার ন্যায় আনন্দাশ্রু।

নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় তারক অলসভাবে একখানা কম্বলের ওপর শুয়ে ছিল।

তারকদা ?

কে মালতী ?

হ্যাঁ, কিন্তু তোমার এ রকম বেশ কেন ? কি হয়েছে ?

মা মারা গেছেন।

মা মারা গেছেন!—মালতী কেঁদে ফেলে।—অথচ তুমি আমায় একটা খবরও দাওনি।

কি কোরে খবর দেবো বলো। হঠাৎ কাশী থেকে টেলিগ্রাম এলো—মার অসুখ। তখনই চলে গেলাম। তারপর সেইখানেই তিনি মারা যান।

ওঃ।

আজই আমি কাশী থেকে ফিরেছি। যাক আমার কথা। তুমি হঠাৎ কি মনে কোরে ?

তোমার খোঁজ নিতে। তুমি ত আমাদের দরকার মনে করো না। তবে আমরা তা মনে করি, তাই...

শুনে সুখী হোলাম, মালতী, আজও যে তোমরা আমাকে মনে রেখেছ এর জন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শুধু ধন্যবাদই, তারকদা ?

তাছাড়া আর কি চাও, মালতী ? তুমি আর তোমার বাড়ীর সকলেই আমার মঙ্গল চাও—তা কি আমি বুঝি না, মনে করো ? তোমরা আমায় স্নেহ করো। ভালবাসো তা আমি জানি। তবে এ সবের প্রতিদানে আমি তোমাদের কিছুই দিইনি তাও আমি স্বীকার কোরছি।

না, তারকদা। তুমিও আমাদের অনেক কিছু দিয়েছ। মনে নেই, সেই যখন আমরা তোমার পাশের বাড়ীতে ভাড়া থাকতাম, তখন তুমি বিনা পারিশ্রমিকে আমাকে আর বিষ্টুকে পড়াতে। সময়ে অসময়ে আমাদের কত কাজ কোরে দিতে। তাই আজ আমি তোমার কাছে শুধু ধন্যবাদ পাবার জন্য আসিনি—এসেছিলাম আর একটা কাজের প্রত্যাশায়।

তারক বলে—এসেছিলাম বোলছ কেন ? তুমি কি এখনই চলে যাচ্ছ ?

হ্যাঁ।

কিসের প্রত্যাশায় তুমি আমার কাছে এসেছিলে, তাতো তুমি বোললে না ?

সে কথা এখন বলা আমার সাজে না কারণ এখন তুমি শুধু ধন্যবাদ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারো না। তাছাড়া মার মৃত্যুর জন্য তুমি শোকাতুর। এ সময়ে নিজের সুবিধার জন্য তোমাকে বিরক্ত করা আমার উচিতও নয়।

তা হয় না, মালতী। বোলতে যখন তুমি এসেছ, তখন তোমাকে বোলতেই হবে ! তারপর তা করা না করা আমার বিবেকের ওপর নির্ভর কোরবে। তুমি বলো।

আমি এখানে আসার আগে জানতাম না যে তোমার এই অবস্থা হয়েছে।—তোমার ওপর দিয়ে কত বড় ঝড় চলে গেছে।

তবু তোমাকে বোলতে হবে।

যদি না বলি ?

তোমার ওপর জোর কোরবো।

কিসের এত জোর, শুনি।

ভালবাসার।

তুমি আমায় ভলোবাসো ?

হাঁ, মালতী। তোমার কি কোন সন্দেহ আছে ?

তুমি আমায় ক্ষমা করো। আমি তোমায় ভুল বুঝে চলে যাচ্ছিলুম।

এবার তোমার কথা বলো।

তুমি আমায় বাঁচাও।

আশ্চর্য হয়ে তারক বলে—কেন ? কি হয়েছে ?

এক দোজপক্ষে বুড়োর সঙ্গে বাবা আমার বিয়ের ঠিক কোরেছেন।

বলো কি !

বিয়ের দিনও স্থির হয়ে গেছে। আর মাত্র পাঁচ দিন আছে এ সময়ে তুমি ছাড়া আর আমার রক্ষা করবার কেউ নেই। বিষ্টুকে দিয়ে খোঁজ নিয়ে আমি জেনেছি লোকটা আবার মাতাল। মাকে আমি সে কথা বললে মা আমার কথা গ্রাহ্যই কোরলেন না। তাঁদেরই বা দোষ কি বলো ? আমার এত বয়স হোলো পয়সার অভাবে তাঁরা আমার বিয়ে দিতে পারছিলেন না। ঐ লোকটা বাবাকে বোলেছে যে, পয়সা ত সে নেবেই না, উল্টে বিয়ের সমস্ত খরচ সেই কোরবে।

আমায় তুমি কি করতে বলো ?

তাও কি তোমায় বোলে দিতে হবে ?

কিন্তু ভাল পাত্র এখন আমি কোথায় পাই ? তাইত কি করা যায় ?

ভাল পাত্র পেলেও আমি বিয়ে কোরবো না।

সে কি ? আশ্চর্য হয়ে তারক বলে—তবে তুমি আমার কাছে কেন এসেছ ?

রহস্য কোরতে। হাঁ রহস্য কোরতে। রহস্য কোরে তোমার

অমূল্য সময় নষ্ট কোরতে। আচ্ছা, আমি চলি। মালতী দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

দাঁড়াও, মালতী। তোমার কথা এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমার মত ছন্নছাড়া জীবকে বিয়ে কোরে তুমি ত শান্তি পাবে না।

মালতী তারককে গড় হয়ে প্রণাম কোরে বলে—তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার শান্তি।

—মালতী, তোমার মত রত্ন পেয়ে আজ আমি ধন্য। আমার শোকতপ্ত হৃদয়ে তুমি কোরলে সুশীতল অমৃতবারি সেচন।

সন্ধ্যের সময় আমাদের বাড়ী আসছ ত?

নিশ্চয়ই। চলো, তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

আমাকে এগিয়ে দিতে হবে না। আমাকে নিয়ে যাবার লোক আছে।

কে?

বিষ্টু।

বিষ্টু!

হ্যাঁ, নীচের ঘরে বসে আছে।

আশ্চর্য! এতক্ষণ ত আমাকে বলোনি।

বলবার দরকার হয়নি। আচ্ছা আসি তাহলে।

এসো। মালতী চলে যায়, তারক চুপ কোরে বসে থাকে। চকিতে তারকের মনে হয়, ক্রমশ চারদিক্ থেকে জড়িয়ে পড়ছে না কি! কিন্তু এ জড়ানোতে সুখ আছে। তবে কি আজ হোতে তার আরম্ভ হোলো নব-জীবনের পথ চলা!

তারককে দেখেই সুমিত্রা চমকে ওঠে।

তারকবাবু!

হ্যাঁ, সুমিত্রা দেবী। মা মারা গেলেন। চলুন, আপনার বাবার কাছে যাওয়া যাক।

হাঁ, আসুন।

তারা দুজনে মিস্টার রায়ের ঘরে ঢোকে।

আশ্চর্য হয়ে, মিঃ রায় বলেন—তারক তোমার এ রূপ?

আমার মা মারা গেছেন।

কই, সুমিত্রা, তুই ত আমায় কিছু বলিস নি।

সুমিত্রা বলে—আমি জানতাম না বাবা। আমিও এইমাত্র জানলাম।

আই সি—মিঃ রায় বলেন।—তাহোলে তারক, তোমার মনের এ অবস্থায় কি কাজের কথা ভাল লাগবে?

মনের অবস্থা আমার বেশ ভালই আছে স্যার।

ভেরি গুড্। তোমার মত বলিষ্ঠ যুবকের মুখেই এ কথা শোভা পায়। হ্যাঁ, শোন। আমি তোমার বইটা পড়লাম। সত্যিই অদ্ভুত হয়েছে। তোমার উপন্যাসের চরিত্রের দৃঢ়তা, কাহিনীর সংগঠন, সংলাপের অপূর্ব ভঙ্গি, বাস্তবের নিখুঁত ছবি—সব এক সঙ্গে তোমার লেখনীদ্বারা সজীব হয়ে উঠেছে। তোমার বইয়ের ছবি আমি তুলবোই। কিন্তু কি মুস্কিল হয়েছে জানো তোমার উপন্যাসের নায়কের অভিনয় করবার মত অভিনেতা নেই।

সুমিত্রা বলে—সে কি, বাবা!

হ্যাঁ। মিঃ রায় বলেন—আমি একটা কথা ভাবছি, তারক। তুমি যদি নায়কের চরিত্রটা অভিনয় করো তাহোলে নিশ্চয়ই ছবিটা ভাল হবে।

আমি জীবনে কখনও অভিনয় করিনি, স্যার।

তাহলেও তোমার নিজের লেখা চরিত্র যদি তুমি নিজে অভিনয় করো নিশ্চয়ই তা ভাল হবে। তা ছাড়া তোমার মধ্যে প্রতিভা আছে।

আমায় আপনি ক্ষমা কোরবেন।

তবে বই সাফল্য লাভ কোরবে না।

তারক বলে—আমি একজনের নাম প্রস্তাব করছি, যদি আপনার মত হয়……

কে তিনি ?

আমি শিবশংকরের কথা বোলছি। আমার মনে হয় ও পারবে।

শিবশংকর ? মিঃ রায় বললেন—এই তোমার বন্ধু—আমাদের শিবু ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওকি পারবে ?

পারবে। আপনি ত জানেন, অ্যামেচারে এমন অনেক অভিনেতা আছেন যাঁরা পেশাদার যে কোন ভাল অভিনেতার চাইতে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়।

তা বটে। মিঃ রায় বলেন—তুই কি বোলিস, সুমিত্রা ? ওকি পারবে বোলে তোর মনে হয় ?

সুমিত্রা বলে—পারবে, বাবা। তাছাড়া তারকবাবু নিজে লেখক, যখন তাঁর বন্ধুর নাম প্রস্তাব কোরছেন, তখন নিশ্চয়ই বুঝতে হবে, যে, তারকবাবু তাঁর বন্ধুর ওপর খুবই আস্থা রাখেন। লেখক চায় তার বইয়ের সফলতা।

হ্যাট্‌স রাইট। মিঃ রায় বলেন—আচ্ছা শিবুকে দিয়েই আমি করাবো। লেট আস নাউ কাম টু অ্যানাদার পয়েন্ট। আমাদের এইবার লেনদেনের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাক।

ও সম্বন্ধে আমি কোন কথা বোলবো না স্যার।—তারক বলে।

কিন্তু……

না স্যার। ওতে আর কোন কিন্তু নেই। এখন আমি উঠি। নমস্কার।

মিঃ রায়ও মাথা নাড়িয়ে নমস্কার কোরলেন।

তারক ও সুমিত্রা মিঃ রায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

গেটের কাছে এসে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করে—আবার কবে আসছেন তারকবাবু?

দু'একদিনের মধ্যেই আসবো সুমিত্রা দেবী। আপনাদের—মানে আপনাকে আর শিবশংকরকে অনেক কথা জানাবার আছে। আজ সময় নেই, থাকলে আজই জানাতাম। তবে এইটুকু শুধু জেনে রাখুন নিতান্ত অভাবনীয় ভাবে হঠাৎ আমার জীবন অন্য পথে ঘুরতে আরম্ভ হোয়েছে।

কোন্ পথে জীবন ঘুরতে আরম্ভ হোয়েছে, তারক? সাইকেল থেকে নামতে নামতে শিবশংকর বলে।—তার দুটো কারণ আমি জানি। একটা তোমার দেহে শোকের চিহ্ন, অপরটা তোমার উপন্যাসের ছবি তোলা হবে। এই ত?

তারক বলে—এ ছাড়াও অন্য কারণ আছে।

কি কারণ?

এখন সময় নেই, ভাই পরে সব কথা বোলবো।

সময় না থাকে খুব ছোট কোরে এক কথায় বোলে ফেল না।

দুটো কারণের একটা হচ্ছে, হঠাৎ আমি একটা বড় সম্পত্তির মালিক হয়েছি। আর দ্বিতীয় কারণ, আমি একটি মেয়েকে বিয়ে কোরতে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছি।

ব্যগ্রভাবে সুমিত্রা বলে—এ কথা সত্যি তারকবাবু?

হ্যাঁ। আচ্ছা নমস্কার।

দ্রুতপদে তারক রাস্তা পার হয়ে একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়ে। বাস থেকে নেমে মালতীদের বাড়ীর সামনে এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। ভেতরে যেতে হঠাৎ তার কেমন যেন সংকোচ হয়। অথচ আগে তার এ রকম সংকোচ কখনও হয়নি। তারক বিষ্টুর নাম ধরে ডাকতে থাকে। মালতীর বাবা হরিচরণবাবু বাইরে বেরিয়ে আসেন।

আরে তারক যে! এস, এস ভেতরে এস। তুমি আবার হঠাৎ বাইরে থেকে ডাকাডাকি আরম্ভ কোরলে কেন? হরিচরণবাবু

বোলে যান—একটু আগে মালতীর কাছে শুনলাম তোমার বিপদের কথা। তার কোন বন্ধুর বাড়ী থেকে ফেরবার সময় তোমার সঙ্গে পথে নাকি মালতীর দেখা হয়েছিল।

পথে!—তারক একটু অবাক হয়ে যায়। তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কথা কইতে কইতে দুজনে ভেতরে প্রবেশ করেন। মালতীর মা দেখে কেঁদে ফেলেন।

আহা! দিদি আমার কি ভাল মানুষই যে ছিল। আর বাবা তারক, তোমাদের বাড়ীর পাশে যখন থাকতাম, তখন দিদি আমায় কি ভালই না বাসতো।—মালতীর মা নিজে নিজেই সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—

যাক, বাবা, তিনি ছিলেন পুণ্যাত্মা, তাই কাশীতে দেহ রেখে বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

তারক অন্য কথা পাড়ে। বলে—বিষ্টুকে দেখছিনা যে?

তার কথা আর বোলোনা বাবা। মালতীর মা বলেন।—সে ছেলে খেলা খেলা কোরেই গেলো। কোন্ দিন না আবার হাত পা ভেঙে বিপদ বাড়ায়। সেদিন ওবাড়ীর ছেলেটা মাঠ থেকে পা ভেঙে ফিরে এল। বিষ্টুটাও অমনি কোন্ দিন বেঘোরে মরবে আর কি!

তারক জিজ্ঞাসা করে—মালতী কোথায়?

লজ্জায় ঘরে ঢুকে বসে আছে—ওর বিয়ের সম্বন্ধ হোচ্ছে কিনা।—মালতীর মা বলেন।

তাই নাকি? কোথায়?

এই ওঁর আপিসের এক বন্ধুর সঙ্গে।

কাকাবাবুর বন্ধুর সঙ্গে মালতার বিয়ে!

কি করি বলো বাবা! পয়সার অভাব—বুঝতেই ত পারছ। এখানে কোন খরচপত্র লাগবে না; তাছাড়া পাত্রের বেশ দুপয়সা আছে—আপিসের বড়বাবু। তবে বয়সটা একটু বেশি—এই যা।

আপনি জেনে শুনে মেয়েকে জলে দেবেন ?

তাছাড়া উপায় কি ?

আমি ভাল পাত্র খুঁজে দেবো।

কিছু মনে কোরো না, বাবা।—ও রকম আশা অনেকেই দেয়।

আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে...

বাধা দিয়ে হরিচরণবাবু বলেন—খোঁজাখুঁজি আমরা অনেক কোরেছি। এখন এটাও হাতছাড়া কোরে কি শেষে বিপদে পড়বো বোলতে চাও। তাছাড়া এদের সঙ্গে আমার পাকা কথা হয়ে গেছে—বিয়ের তারিখ পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে। তুমিই বলো অনিশ্চিতের ওপর নির্ভর কোরে কি উপস্থিত সুযোগ ছেড়ে দেওয়া যায়। বিশেষ কোরে চেষ্টার ত আমি কোন ক্রুটী করিনি।

তারক বলে—হাঁ, কোরেছেন ? আপনারা কিছুই খোঁজ করেন নি।

খোঁজ করি নি ?

না। কৈ, আমাকে একদিনও বোলেছিলেন ?

তোমার হাতে পাত্র ছিল নাকি ?

হাঁ, নিশ্চয়ই ছিল। তারক বলে—ছিল . কেন—এখনও আছে। আমার হাতে অন্য পাত্র থাকুক বা না থাকুক, আমি ত নিজে আছি। হাঁ, আপনাদের আমি বোলছি, আমিই মালতীকে বিয়ে কোরবো। আপনাদের কোন আপত্তি আছে ?

তুমি বিয়ে কোরবে ?—মালতীর বাপ মা আশ্চর্য হয়ে যান।

হাঁ, হাঁ। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ? আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে ত বলুন; আর যদি আপত্তি থাকে ত বলুন—কিসে আপত্তি ?

হরিচরণবাবু বলেন—না বাবা, আপত্তি আর কি। এ আমরা কোনদিন আশাই করি নি। তবে...

বাধা দিয়ে মালতীর মা বলেন—থামো। আমি প্রাণ থাকতে ওই ঘাটের মড়ার সঙ্গে বিয়ে দেবো না।

তারক বলে—শুনুন, আমার আর একটা কথা আছে।

মোলায়েম স্বরে মালতীর মা বলেন—বলো বাবা, বলো।

তারক বলে—দেখুন, আমার কালাশৌচ কাটতে এক বছর লাগবে। তার পর আমি মালতীকে বিয়ে কোরবো। আমাকে আপনারা বিশ্বাস কোরতে পারেন।

মালতীর মা বলেন—তাই হবে বাবা, তাই হবে। শুনছ, তুমি এখুনি সেই বুড়োকে জানিয়ে এস তার সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেবো না।

মালতীর বাবা মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলেন—তাই ত এখন আমি কি বলি গিয়ে?

তা আমি কি জানি? মালতীর মা বলেন—যেমন তুমি আগ বাড়িয়ে সম্বন্ধ কোরতে গেছিলে।

আমি গেছলাম! তুমিই ত আমাকে জোর কোরে পাঠিয়েছিলে। আমি ত প্রথমে একটু আপত্তি কোরেছিলাম—তুমি কি 'ও ছাড়া আর পাত্র পাচ্ছ কোথায়? ওখানেই মেয়ের বিয়ে দেবো'—এই সব কথা বলোনি? এখন আমার দোষ হোলো।

নিশ্চয়ই তোমার দোষ—নিজেকে আর নির্দ্দোষী সাজতে হবে না। আমার পোড়া কপাল! এই মিন্‌সেকে নিয়ে ঘর কোরতে হয়!

রেগে মালতীর বাবা বলেন—দেখো, মুখে যা আসছে তাই বোলছ। খবরদার। মিন্‌সে বোলো না—হাঁ!

হুঁ! বোলবো না—নিশ্চয়ই বোলবো।

মাগীর মুখ আমি ভেঙে দেবো।—

তারক নিজেকে বিশেষ বিব্রত বোধ করে। হঠাৎ লক্ষ্য করে সামনের ঘরের দরজার পাশ থেকে মালতী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তারক নিঃশব্দে চলে যায়।

এবার মালতীর মা খুব চীৎকার কোরে বলেন—দেখো আমায় মাগী বোলো না। ফের যদি বোল্‌বে ত তোমার একদিন কি আমার এক দিন।

যাও, যাও আর গলাবাজি কোরতে হবে না। হঠাৎ হরিচরণ বাবুর লক্ষ্য পড়ে—তাই ত তারক কোথায় গেল। তাড়ালে ত চেঁচামেচি কোরে ছেলেটাকে!

না, সে চলে যায় নি, ও ঘরে গিয়ে মালতীর সঙ্গে কথা বোলছে।

মালতীর সঙ্গে আবার কি কথা বোলছে?

সে তুমি কিছু বুঝবে না।—মালতীর মা বলেন।—যাও বাইরের ঘরে গিয়ে তামাক খাওগে।

ও ঘরে গিয়ে তারক মালতীকে জিজ্ঞাসা করে—কি বোলছ?

বোলবো আবার কি! তোমার ভাল লাগছিল ঐ ঝগড়া শুনতে?

ও, এই ব্যাপার।

আজ্ঞে, হ্যাঁ। আবার কবে আসছো বলো। এখন ত আর কিছু খাবার জো নেই।

ঠিক বোলতে পারলুম না, মালতী। কাল পরশুর মধ্যে আমাকে একবার বাইরে যেতে হবে।

কবে ফিরবে?

তা ঠিক বোলতে পারছি না। তোমাকে অনেক কথা জানাবার ছিল। কিন্তু আজ আর শরীরটা ভাল লাগছে না। কাল সারারাত ট্রেনে এসেছি, তারপর···

পরেই জানবো। এখন বাড়ী যাও—বড় ক্লান্ত হয়েছো।—মালতী ভূমিষ্ঠ হয়ে তারককে প্রণাম করে।

মালতী!

বলো!

তারক কিছু বলে না—শুধু মালতীর হাতখানির ওপর একটু মৃদু চাপ দিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে যায়।

বিষ্টু পেছন থেকে ডাকে—তারকদা!

কিরে বিষ্টু?

চল না, খাওয়াবে চল না। খেলার মাঠ থেকে আমি অনেক আগে ফিরেছি। বাইরে থেকে আমি সব শুনেছি। তোমাকে খাওয়াতেই হবে।

কিন্তু আমার কাছে ত বেশি পয়সা নেই।

যা আছে ওতেই হবে। এসো।

দুজনে খাবারের দোকানে ঢোকে।

ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে বড়দা বলেন—বন্ধুগণ, দিনের পর দিন আমাদের কাজের গুরুত্ব যত বেড়ে যাচ্ছে—আমাদের চার পাশের বিপদও তত ঘনীভূত হয়ে আসছে। প্রতি পদে আমাদের বিরাট্ বিরাট্ বিপদের সম্মুখীন হোতে হচ্ছে, আর হবেও। আমাদের চিত্তকে গড়ে তুলতে হবে কঠিন খাঁটি ইস্পাতের মত দৃঢ় মৃত্যুঞ্জয়ী দুর্গে। আমাদের সামনে বারে বারে আসবে কত প্রলোভন, কত স্বার্থের সুখের ছবি, কিন্তু প্রলোভন আর স্বার্থের সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে সেই বৃহত্তম কল্যাণের দিকে এগিয়ে যেতে হবে—যেখানে নিজের তৃপ্তি নয়—বহুর তৃপ্তি।

সেদিনের পৃথিবীতে থাকবে না ছোট বড় ভেদ, থাকবে না ধনী-দরিদ্র প্রভেদ—শুধু থাকবে একটা জাতি—সে জাতি মানুষ। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধেই শুধু আমাদের আক্রোশ নয়—আমাদের আক্রোশ ধনীদের ওপর। আমাদের দেশের ধনীরা শুধু যে দরিদ্রের ওপর অত্যাচারই কোরছে, তা নয়—তারা বিদেশী শাসন-ব্যবস্থা কায়েম রাখারও চেষ্টা কোরছে।

আমরা ভারত তথা পৃথিবীতে চাই সমাজতান্ত্রিক রাজ-প্রতিষ্ঠা—আমরা হিংসা-অহিংসা বুঝি না—আমরা বুঝি শুধু ব্যক্তি সাধারণের স্বাধীনতা। আর তার জন্য আমরা যে কোন উপায় অবলম্বন কোরবো, কেন-না ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত আছে স্বাধীনতা লাভের পথ। হাঁ, অহিংস ভারতের প্রতিষ্ঠা আমরাও চাই। কিন্তু যে হিংস্র বুর্জোয়া

সাম্রাজ্যবাদী পশু আমাদের বুকের ওপর চেপে বসেছে তাকে সরাবার জন্য চাই এমন এক অস্ত্র যে অস্ত্রের আঘাতে তারা ভারত ছাড়তে পথ পাবে না। এটা জেনে রেখে দিও যে পশুর কাছে ধর্মের ব্যাখ্যা মিথ্যা।

ঘরের মধ্যে আবার স্তব্ধতা বিরাজ করে। রেবা মৃদুকণ্ঠে বলে—বড়দা, একটা কথা জিজ্ঞাসা কোরবো ?

করো।

৪২ সালের বিপ্লব আমাদের বিফল হয়েছে, কিন্তু সফলতার দিকে আমাদের এগিয়ে দিয়েছে—তা স্বীকার করি। সংগঠনের কাজ আমরা করতে চাই এবং করছিও ; কিন্তু মাঝে মাঝে দুএকটা চালের গুদাম লুঠ কোরে আর···

লাভ আছে, রেবা। বিপ্লবকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই—তাই এই ছোট ছোট সংঘাত—সেই আগত বিরাট্ গণবিপ্লবের পটভূমিকা।

রেবা বলে—সেই বিপ্লব আসতে কত দেরি ?

বিপ্লব আসবে সেই দিনই যে দিন সমস্ত জনগণের মধ্যে আসবে আলোড়ন। তবে সেদিনের বেশি বিলম্ব নেই। হয়ত কয়েক বছরের মধ্যেই ভারত তথা সারা পৃথিবীর মধ্যে হবে গণ-অভ্যুদয়।

কম্‌রেডস্, সেই আগতপ্রায় বিপ্লবের জন্য হোতে হবে আমাদের সকল রকমে প্রস্তুত। বিপ্লব দিন-ক্ষণ কাল দেখে আসে না—আসে একটা প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের মত অকস্মাৎ।

বাইরে পদশব্দ শোনা যায়।

কে ?

মানুষ।

সুশীল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। বড়দা প্রশ্ন করেন—কি খবর, সুশীল ?

সুরথ ধরা পড়েছে।

ও।

সুশীল বলে—সুরথ ধরা পড়লেও ওখানে কাজ আমাদের সম্পূর্ণ সফল হয়েছে।

ছোট একটা রেলওয়ে স্টেশন—হলুদপুর। সকালের একটা ট্রেন থেকে সুটকেশ হাতে তারক নামলো। স্টেশন মাস্টারকে টিকিটখানি দিয়ে তারক জিজ্ঞাসা করলো—এখান থেকে রূপনগর কত দূর।

তা মাইল পাঁচেক হবে। আপনি কার বাড়ীতে যাবেন?

ধনপতিবাবুর বাড়ী।

ও, আমাদের জমিদার বাড়ী।

আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানে কি কোন যান-টান—মানে গোরুর গাড়ী পাওয়া যাবে না?

আচ্ছা, আপনি একটু ঘরের ভেতর এসে বসুন, আমি দেখছি। মাষ্টারমশাই ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যান। তারক বলে—দাঁড়ান, আমিও আপনার সঙ্গে, যাব।

মাষ্টার মশাই বলেন—না, না আপনি ঘরে বসুন। জিনিষপত্রগুলো চারদিকে খোলা পড়ে রয়েছে।

আপনাদের এখানে কুলি কি...

হেঁ, হেঁ—আছে একটা; তা সেতো কাল রাত্রে মালটেনে এখনও বেহুশ হয়ে পড়ে আছে। বসুন, বসুন, আমি এলাম বোলে! ভদ্রলোক চলে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাষ্টারমশাই একটা গোরুর গাড়ী ডেকে আনেন। তারক গাড়ীতে উঠে বলে—আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম।

ছি, ছি! কষ্ট বোলছেন! এত আমার কর্তব্য—আপনি অচেনা জায়গায় এসেছেন। এতটুকু কাজ যদি আমি না করি ত আমারই অপরাধ হবে। —গাড়োয়ানকে লক্ষ্য কোরে বলেন—ওরে বাবা, একটু ফুর্তি কোরে ওরে নিয়ে যাস। —তার পিঠে মৃদু চপেটাঘাত করেন। তারক বলে—আচ্ছা। নমস্কার।

নমস্কার—

গাড়ী ছেড়ে দেয়। তারক দূর থেকে বলে—আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

নিশ্চয়ই, এই পথ দিয়েই ত ফিরবেন...মাষ্টার মশাই আর যে কি বললেন, তারক শুনতে পায় না। টুং টাং শব্দ কোরতে কোরতে গোরুর গাড়ী এগিয়ে চলে।

তারক চলেছে তার জন্মভূমিতে, অথচ সে এখানকার কত অপরিচিত কত অজানা। কে জানে, জন্মভূমি তাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা কোরবে। তার দাবী সে মেনে নেবে কি? না কলংকের আর অপমানের বোঝা নিয়ে আবার এই পথেই তাকে ফিরে যেতে হবে? তারকের মন চিন্তায় আকুল হয়ে ওঠে। একটা বড় বাড়ীর গেটের সামনে গাড়ীটা এসে থামলো। তারক স্যুটকেশ হাতে নেমে পোড়ে গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়ে বিদায় করে।

গেটের পাশে দরোয়ানের ঘরটা অনেক দিন থেকেই যে বন্ধ হয়ে আছে তা দেখলেই বোঝা যায়।

অধিকাংশ জানলা দরজাই বন্ধ। মনে হয়, বাড়ীটার ওপর কেমন যেন একটা ধূসর মলিনতার ভাব এসে গেছে।

বাগানের পথটা অতিক্রম কোরে বাড়ীর সামনে এসে তারক ডাকাডাকি করে। একটু পরে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাইরে এসে দেখে অবাক হয়ে তাকান। তারক বুঝতে পারে, ইনিই তার কাকা, কেন-না মায়ের দেওয়া ছবি গুলোর মধ্যে এর যৌবনের ছবিও ছিল। অবশ্য মুখ এখন যথেষ্ট তফাৎ হয়েছে। তবে অনায়াসে চেনা যায়। তারক প্রণাম করে।

তুমি—আপনি?

নিম্নকণ্ঠে তারক বলে—আমি আপনার দাদা মহীপতিবাবুর ছেলে।

অ্যাঁ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এ কি সত্য?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার মা?

আমার পরিচ্ছদ...

বাধা দিয়ে ধনপতিবাবু বলেন—বৌদিও নেই?

না।

এতদিন আসেনি কেন?

আমি জানতাম না। মারা যাবার সময় মা আমাকে বলে যান, আর...

থামো তুমি। ভদ্রলোক রেগে প্রায় কেঁদে ফেলেন।

আমার সেই একদিনের ভুলকে তিনি জীবনেও ক্ষমা কোরতে পারলেন না!

ধনপতিবাবু বলেন—সারাটা জীবন আমায় তীব্র অনুশোচনার মধ্য দিয়ে কাটাতে হলো—হ্যাঁ, তুমি কেন এসেছ?

আমার বাড়ীতে...

তোমার বাড়ীতে? একথা সত্য?

হ্যাঁ, আমার কাছে বহু প্রমাণ আছে।

প্রমাণ! —ধনপতিবাবু প্রচণ্ডবেগে তারকের গালে চপেটাঘাত করেন। রাস্‌কেল। আমি তোমার কাছে প্রমাণ চেয়েছি! চীৎকার কোরে বলেন আমি কি তোমায় সম্পত্তি দেব না বোলোছি। আমি শুধু তোমায় জিজ্ঞাসা কোরেছিলাম যে, তোমার এ কথা কি সত্য।

বাবা! বাবা!—ঘরের ভেতর থেকে একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসে।

তুমি থাম, রমা—ধনপতিবাবু বলেন—বেশ, তোমাদের বাড়ী তোমরাই থাকো, আমি এখুনি চলে যাচ্ছি।

তারক অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলে—আমায় আপনি ক্ষমা করুন, কাকাবাবু। তারক ধনপতিবাবুর পা জড়িয়ে ধরে।

ওঠো বাবা, ওঠো। ধনপতিবাবু তারককে তুলে ধরে বলেন—বড় লেগেছে, না বাবা? গালে হাত বুলিয়ে দেন।—রমা, তোর দাদা—আমাদের বংশের দুলাল।

আমার দাদা! রমা আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

হ্যাঁ, মা, তোর জ্যেঠামশাইয়ের ছেলে। —তোমার ছেলে-বেলায় আমি তোমার নাম দিয়েছিলাম 'তারক'। এখনও সেই নামই আছে নাকি?

আজ্ঞে, হাঁ।

বেশ, বেশ! এস, ভেতরে এস।

বাইরে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। রেবার ঘুম ভেঙে যায়।

কে?

মানুষ!

রেবা দরজা খুলে দেয়। ঘরে প্রবেশ করেন সুটকেশ হাতে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

রেবা বলে—কৈ দেখি। বৃদ্ধ লোকটি একটি গোল চাকতি দেখায়।

রেবা বলে—হুঁ, আপনি কোথা থেকে আসছেন।

বোলছি। দোরটা আগে বন্ধ কোরে দিন। রেবা দরজা বন্ধ কোরে বলে—

আসুন, ভেতরে।

ভদ্রলোক ঘরের ভেতরে গিয়ে সটান বিছানায় শুয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে তিনি বলেন—আমি আসছি মাদ্রাজ থেকে। এই সুটকেশের মধ্যের জিনিসগুলো আপনাকে দিতে এসেছি।

কিন্তু আপনার ত আগামী কাল আসবার কথা ছিল।

হ্যাঁ, তাই ছিল। কিন্তু পুলিশের জন্য হঠাৎ আমাদের প্রোগ্রাম পালটাতে হয়েছে।

হঠাৎ ভদ্রলোক বিছানার ওপর উঠে বসে বলেন—কই আপনার নিদর্শন ত এখনও দেখান নি ?

এই দেখুন—রেবা গলার হারের লকেট খুলে দেখায়।

ঠিক আছে। ভদ্রলোক আবার শুয়ে পড়েন।

রেবা বলে—আপনি বেশ চমৎকার বাংলা বলেন ত।

হিন্দুস্থানের অনেক ভাষাই জানি।

আপনি ত বাঙ্গালি ?

না, আমি হিন্দুস্থানী মানুষ।

তবু জন্মস্থান ?

পৃথিবী।

বাঃ, এই বুড়ো বয়সে আপনার ত খুব মনের জোর।

বুড়ো হোলে কি মনের জোর কমে যায় নাকি ? তাছাড়া আমি বুড়ো নই। এটা আমার ছদ্মবেশ।

ওঃ।

বাড়ীতে আর কাউকে দেখছি না যে।

আমার বুড়ী মা আছেন ওধারের ঘরে।

তা হোলে দেখছেন, আপনার বুড়ী মায়ের মনের জোর। আপনাদের —মানে বাঙ্গালিদের একটা বড় দোষ…

কি দোষ ?

নিজেদের তারা বড় বুদ্ধিমান্ মনে করে।

আমি বাঙ্গালি নই।

এইবার আপনি আমায় হারালেন, কমরেড। যাক্, আর কথা নয়। আমি এখন একটু ঘুমোবো। ভোর হবার কিছু আগেই ডাকবেন।

বিকাল বেলায় ঘরের মধ্যে তারক চুপ কোরে বসে ছিল। রমা প্রবেশ করে।

দাদা!

কি রে?

কি আবার। সমস্তক্ষণ ঘরের ভেতর বসে আছ। আজ কদিন হলো এখানে এসেছ তা একবারও বাড়ীর বার হোলে না।

বাইরে ঐ অন্নহীনের চীৎকার আর ভাল লাগে না।

বেশ ত, বাড়ী থেকে না বেরোও, বাগানে ত বেড়াতে পারো। এস, বাগানে এস।

এখুনি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। রমা তারককে জোর কোরে বাগানে নিয়ে যায়।

দুজনে বাগানে গল্প কোরতে কোরতে এখানে সেখানে বেড়াতে থাকে। বাগানের মধ্যস্থলে বিরাট্ দীঘিটার সামনে এসে তারক বলে—দীঘিটা একেবারে মজে গেছে।

হ্যাঁ, দাদা। কিন্তু এককালে এই দীঘিতে জ্যোৎস্না রাতে শুনেছি আমাদের পূর্বপুরুষরা ময়ুরপঙ্খীতে চেপে হাওয়া খেতেন। কাচের মত পরিষ্কার ছিল এর জল। আর এই বাগানে রোজ ফুটতো সহস্র রকমের সুগন্ধ ফুল। আমিও ছোট বেলায় এই বাগান আরও কত সুন্দর দেখেছি। আমি একা আর কত যত্ন করবো? তবু ঠাকুরবাড়ীর সামনের ফুলগাছগুলোতে রোজ জল দিই।

অতীতের কথা ভেবে তোমার দুঃখ হয়?

হ্যাঁ, দাদা।

কিন্তু দুঃখ করা ত উচিত নয়। ভেবে দেখো, এই প্রাসাদ, এই উদ্যান, এই সরোবর তৈরী হয়েছিল কত গরীবের অন্ন মেরে, কতজনকে নিরাশ্রয় কোরে, বঞ্চিত কোরে। তুমি জানোনা এর চারদিকে রয়েছে কতজনের অভিশাপ, কতজনের অশ্রু। কতজনের রক্ত।

শুনেছি। দাদা! আগেকার লোকেরা সুখী ছিল।

না—আমরাই নিজেদের অপরাধ ঢাকবার জন্য তাদের তাই বোঝাবার চেষ্টা কোরতাম, আর নিজেদের পাপী মনকে এই বোলে

সান্ত্বনা দিতাম। বহু জনকে বঞ্চিত কোরে গড়ে ওঠে একটি ধনীর সৌধ!

কিন্তু ভাগ্যফল……

এও আমাদের নিজেদের সুখের জন্য গড়া কথা। তবে এ বুজরুকি আর বেশিদিন চলবেনা।

তাহোলে কি হবে?

সবাই সমান হয়ে যাবে। ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, পৃথিবীতে আর থাকবে না।

সে হবে না দাদা।

না, ভাই; সেইটাই সম্ভব। আজ দেখছ যা, জেনে রাখো এইটাই চরম অসম্ভব, অপ্রাকৃত, অবাস্তব।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না দাদা।

নিজের মনকে প্রসার করে দাও, নিজের সংকীর্ণ সত্তা ভুলে গিয়ে শুধু মনে করো তুমি একজন পৃথিবীর মানুষ—ওই বঞ্চিত সর্বহারাদেরই একজন। দূরে রাস্তায় দেখা গেল একদল শীর্ণ লোক চলেছে। তারক জিজ্ঞাসা করে—ওরা কোথায় যাচ্ছে, জানো।

পেটের দায়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে যাচ্ছে। আমাদের গ্রামেও অনেক লোক চলে গেছে।

সূর্য অনেকক্ষণ হোলো অস্ত গেছে। চারদিক আবছা অন্ধকার হয়ে এল। সেই রহস্যময় অন্ধকারে সর্বহারার দলটি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নিঝুম আবছা জ্যোৎস্না রাত্রি। তারক জানালার কাছে বসে ভাবছিল অনাগত দিনের কথা। ঝুপ কোরে একটা শব্দ হোতেই তারক দেখতে পেল একটা লোক পাঁচিল টপকে বাগানে লাফিয়ে পড়ে। চোর নাকি? আবছা জ্যোৎস্নায় তারক বেশ দেখতে পায় যে, লোকটা

ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে একটা মালখেওর ঝোপের ভেতর গা ঢাকা দেয়। ব্যাপার কি?

ঘরের কোণ থেকে লাঠিগাছটা নিয়ে আর অপর হাতে টর্চ নিয়ে তারক ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে। তীব্র টর্চের আলোক ঝোপের ভেতর ফেলে তারক ভারি গলায় বলে—কে? অতর্কিতে মুখের ওপর একরাশ আলো পড়ায় লোকটা একটু সংকুচিত হয়ে যায়।

একি?—অত্যধিক আশ্চর্যে তারকের মুখ দিয়ে বার হয়—সুশীল!

আরে তারক নাকি।—সুশীলও অবাক হয়ে যায়। ঝোপের ভেতর থেকে সে বেরিয়ে আসে।

তুই এখানে, তারক?—সুশীল প্রশ্ন করে।

এটা আমার কাকার বাড়ী।

কাকার বাড়ী। কই তোর কাকার কথা ত আগে শুনিনি।

শুনে থাকো বা না শুনে থাকো তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু তুমি এখানে এ অবস্থায় কেন?

বোলছি। আজ রাতটার মত তোদের বাড়ীতে আশ্রয় দিবি?

কেন দেবো না।

তবে চল, ঘরে গিয়েই সব কথা বোলবো।

দুজনে ঘরে এসে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসে।

তোর মুখময় দাঁড়ি কেন? সুশীল জিজ্ঞাসা করে।

মা মারা গেছেন।

ও।

তোর কথা বল।

না বোললে তোর বাড়ীতে কি থাকতে দিবি না?

সে কথা হচ্ছে না; যদি তোমার আপত্তি থাকে ত বলো না। তবে মানুষের কৌতূহল বোলে একটা জিনিস আছে।

তবে শোন—খুব সংক্ষেপে বোলছি। আমি একজন বিপ্লবী। ধনীর ঐশ্বর্য লুঠ করা আর বঞ্চিতের মধ্যে প্রেরণা আনাই আমার কাজ।

তুমি কি একজন কুমুনিষ্ট !—তারক প্রশ্ন করে।

না, তুমি যা ভাবছ তা কিন্তু নই, তারক। সাম্যবাদের মুখোস পোরে আজকাল ভারতে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। তাদের আমি ঘৃণা করি। আমি একজন [illegible]। আমি আপোশহীন সংগ্রামে আস্থা রাখি।

তোমাদের নেতা কে ?

বিশেষ কোন নেতাকে সামনে রেখে আমরা অগ্রসর হই না। আমরা আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছি। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো তারক। তুই কি নিরুপদ্রবে এই খানেই ঘর বাঁধবি ?

তুই কি বোলতে চাস, তা আমি বুঝেছি। তবে এইটুকু তুই শুধু জেনে রাখ যে, তোর বন্ধু হবার মত এখনও পূর্ণ যোগ্যতা আমার আছে। দেশ শুধু তোর নয়—আমারও।

আমায় ক্ষমা কর ভাই। সুশীল তারককে বুকে জড়িয়ে ধরে।

বাইরে খড়মের শব্দ শোনা যায়। তারক বলে—ভোর হয়ে এল। কাকাবাবু উঠেছেন, বাগানে বেড়াতে যাচ্ছেন।

খড়মের শব্দ ক্রমশ ঘরের দিকে এগিয়ে আসে।

তারক, তোমার ঘরে আলো জ্বলছে যে ?—লণ্ঠন হাতে কাকাবাবু দরজার কাছে এসে উপস্থিত।

আমার এক বন্ধু রাত্রে এসেছে। সকালে বোলবো বোলে রাত্রে আর আপনাকে বিরক্ত করিনি।

সুশীল ধনপতীবাবুকে প্রণাম করে।

থাক, থাক, বাবা। কাকাবাবু বলেন। কিন্তু তারক, তোমার রাত্রেই বলা উচিত ছিল। অতিথি রাত্রে অভুক্ত…

কাকাবাবু—সুশীল বলে—আমি অতিথি হয়ে আসিনি। তারক আর আমি সমান।

বেশ, বেশ। তোমার নামটি কি, বাবা ?

কল্যাণ—সুশীল বলে।

কল্যাণ—বেশ নামত। আচ্ছা, চলি, বাবা—একটু বাগানে বেড়াবো।

আজ্ঞে, হ্যাঁ। তারক বলে। খট খট শব্দ কোরতে কোরতে কাকাবাবু চলে যান। ঘরের মধ্যে নীরবতা নেমে আসে। তারক বলে—

চল, বাগানে বেড়াইগে।

কাকাবাবু বেড়াচ্ছেন যে।

তাতে কি হয়েছে। বাগান লম্বায় প্রায় এক মাইল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

ভোরের আলো ফুটতে তখনও বেশ দেরি আছে। চাঁদ ডুবে গেছে। অন্ধকার বাগানে তুজনে নীরবে ঘুরে বেড়ায়। দূরে একটা আলো দেখা যায়।

সুশীল প্রশ্ন করে—ওটা কিসের আলো?

তারক বলে—কাকাবাবু লণ্ঠন হাতে বেড়াচ্ছেন। দেখছ না আলোটা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে।

সরোবরে পাড়ে এসে তুজনে মাটির ওপর বসে। ধীরে ধীরে উষার আলো পূর্ব গগণে ফুটে ওঠে। সরোবরের জলেও প্রভাত সূর্যের নবীন ছটা প্রতিফলিত হয়। ওরা তুজনে এবার বাড়ীর পথ ধরে। বাড়ীর কাছে একটা ফুলগাছ থেকে রমা ফুল তুলছিল। পেছন থেকে তারক ডাকে—

রমা!

দাদা। হাস্যমুখে পেছন ফিরে তারকের সঙ্গে সুশীলকে দেখে সংকুচিত হয়ে পড়ে।

আমার বন্ধু কল্যাণ, কাল রাত্রে এসেছে।

কই। আমি ত জানি না। রমা বলে।

তুই জানবি কি কোরে। তুই তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিস।

হুঁ। আমার বুঝি নাক ডাকে।

ডাকে না! যেদিন আমি প্রথম আসি, সেদিন ত রাত্রে আমার ভয় লেগে গেছিলো।

মিথ্যা কথা বোলো না। তোমার বন্ধু বিশ্বাস কোরে বোসবে।

অবিশ্বাস কি কোরে করি বলো, ভাই! সুশীল বলে।—কাল রাত্রে ত আমি নিজের কানে শুনেছি।

বেশ! বেশ! তোমাদের তাতে কি? দুজনেই মিথ্যাবাদী রমা হাতের ফুল ফেলে দিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলে।

তারক ব্যস্ত হয়ে বলে—আরে, আরে! এতে কাঁদবার কি আছে?

নাঃ, কাঁদবো না, নিজেরা মিথ্যা কথা বোলবে।—রমা এবার সত্যই কেঁদে ফেলে।

না, না—ঘুমুলে তোমার নাকের শব্দ হয় না।—সুশীল বলে। আমরা মিছে কথা বোলছিলাম।

ও, তাই বলো। রমা বলে।

মেয়ের মুখে এইবার হাসি ফুটেছে। তারক বলে।

হাসবো না কেন? নিশ্চয়ই হাসবো। আমার মুখে আমি হাসবো।—রমা খিলখিল কোরো হেসে ওঠে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলে—

মুখে দাড়ি কেন? দাদার না হয় অশৌচ হয়েছে।

আমারও যে অশৌচ হয়েছে। সুশীল বলে।

কি হয়েছে?

দেশ-মাতৃকার...

থাক, থাক; আর বোলতে হবে না—বুঝতে পেরেছি। এমনি না হলে কি আর দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। যত সব পাগল।

সুশীল বলে—তুমি কিন্তু পাগলী।

কেন?

এই কাঁদছো, আবার পরক্ষণেই হাসছো। পাগলী নয় ত কি?

বেশ! আমি পাগলী ত তোমাদের কি?—রমা ঠোঁট বাঁকিয়ে গ্রীবা ভঙ্গি কোরে চলে যায়। যেতে যেতে পেছন ফিরে জিজ্ঞাসা করে—

দাদা ত চা খায় না। কল্যাণ দা ও কি দাদার মত নাকি?

সুশীল বলে—না, ভাই আমি চা খাই।

রমা বলে—তবে তাড়াতাড়ি বাড়ী এস! আমি এখুনি চা কোরবো। চা জুড়িয়ে গেলে আমি জানি না কিন্তু। চঞ্চল পদক্ষেপে রমা বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আচমকা সুশীলের ঘুম ভেঙে যায়। কে যেন তার শরীরটা ঠেলছে।

কে?

আমি। ভারি গলায় উত্তর আসে।

কাকাবাবু?

হ্যাঁ।

হঠাৎ এত রাত্রে?

তোমার সঙ্গে আমার গোটা কতক কথা আছে। ধনপতিবাবু বলেন—তোমার আসল রূপ কি?

তার মানে?

আমাকে ভুল বোঝবার চেষ্টা কোরো না। আজ সারাদিন একজন অপরিচিত লোককে আমাদের বাড়ীর চারদিকে ঘোরাঘুরি কোরতে দেখেছি। তাছাড়া তোমার চালচলনও রহস্য জনক। এ বিষয়ে তুমি কি বলো?

আমি কিছু বোলতে চাই না। আপনি কি বোলতে চান, তাই বলুন।

অনেক দিন পরে ঘরের ছেলে ঘরে এসেছে। আমাদের বংশের ঐ একটি মাত্র রতন। তাকে তুমি আমায় ভিক্ষা দাও।

আপনি কি বোলছেন!

তোমার জীবনের সঙ্গে তারকের জীবন এক সাথে গেঁথোনা। বংশের ঐ শেষ সম্বলটিকে তুমি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়বার জন্য ডেকো না। তুমি আমাদের মুক্তি দাও।

আপনি আমাকে চলে যেতে বোলছেন।

হ্যাঁ, তুমি চলে যাও—এখুনি চলে যাও। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তোমাদের জয় হোক। তারককে বাদ দিয়ে যদি আমার দ্বারা কিছু সম্ভব হয়—তাও আমি কোরতে প্রস্তুত। টাকা দিয়ে...

থাক। সুশীল বলে—ঐ টাকা জিনিসটাকে আমরা বড় ঘৃণা করি। টাকাই পৃথিবীর এই বৈষম্যের প্রধান কারণ।

তাহোলে তুমি চলে যাও।

এই রাত্রে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—এই রাত্রে।

কিন্তু তারকের সঙ্গে দেখা না কোরে ত আমি যেতে পারি না!

আমি তোমার কোন কথা শুনবো না।—নৈশ অন্ধকারে বীভৎস কণ্ঠে ধনপতিবাবু বলেন—তুমি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে—বেরিয়ে যাও...

বাড়ী কি একা আপনার?

হ্যাঁ, আমার বাড়ী। তুমি...

কাকাবাবু! তারক ঘরে ঢুকে বলে—এ কথা কি সত্য যে বাড়ী একা আপনার।

তারক! তুই কি বোলছিস?

চলো বন্ধু। তারক দৃঢ় কণ্ঠে বলে—এ বাড়ীতে আমাদের স্থান নেই। যারা মিথ্যা আভিজাত্য আর ভেঙে পড়া অতীতের গৌরব নিয়ে পরকে প্রতারণা কোরে কাপুরুষের মত থাকতে চায়, তাদের সঙ্গে

আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। আমি চললাম কাকাবাবু; আপনি আমায় আশীর্বাদ করুণ।

বেশ। একদিন অযাচিত ভাবে অতর্কিতে এসে ছিলে আমার শূন্য বুকে। আজ আবার তেমনি অকস্মাৎ আমার বুকের পাঁজরা ভেঙে দিয়ে চলে যাচ্ছ। তা যাও। আমি আর কোন বাধা দেব না —শুধু এইটুকু বোলবো যে তুমি আমায় ভুল বুঝে গেলে।

সুশীল বলে—তারক, আমাকে তুই বিদায় দে। আমার জীবনের সঙ্গে তোর জীবন জড়াতে যাসনি। তোর পেছনে অনেক টান।

তারক এত দুর্বল নয়, বন্ধু। তারক কঠিন হোলে সে যে কি ভীষণ কঠিন হোতে পারে তা সে তুমি জানো না। এস বন্ধু।

দুজনে ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে যায়।

বাবা! বাবা!—ছুটতে ছুটতে রমা ঘরে ঢোকে।

তুমি ওদের কোন বাধা দিলে না বাবা?—বাবা। একি! তুমি কথা কইছ না কেন?—রমা ধনপতি বাবুকে ঝাঁকানি দিয়ে বলে—ওদের ফেরাও, বাবা। তুমি কি কোন কথা কইবে না? তুমি কি পাথর হয়ে গেলে?

ধনপতিবাবু পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রমা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। অন্ধকার পথে সে ছুটে চলে কত দূর!—আর সে পারে না। কোথায় গেল দাদারা? ক্লান্ত পদক্ষেপে সে ছুটতে থাকে।...ঐ দূরে ছায়ার মত কারা যেন যাচ্ছে না? আরও জোরে সে ছুটে এগিয়ে যায়। পেছনে দ্রুত পদ শব্দ শুনে তারক ফিরে তাকায়।

কে?

দাদা! হাঁপাতে হাঁপাতে রমা বলে—বাড়ী এস দাদা! তোমার দুটি পায়ে পড়ি। কল্যাণদা!

সুশীল বলে—আমি চললাম তারক।

তারক বলে—দাঁড়াও ভাই! আমাকে অতটা ভীরু ভেবো না। সামান্য এই বাধাতেই কি আমি পেছিয়ে যাব? তুমি ফিরে যাও, রমা।

ফিরে আমি যাব না। কল্যাণদা আমি কি তোমাদের সাথে যেতে পারি না

না।—সুশীল বলে।

কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে যাবই।

রমা! তারক বলে—আমাদের সময় নষ্ট কোরো না, বাড়ী, যাও গিয়ে বাবাকে দেখোগে। কতটুকু তুমি জানো সংসারের?

আমার বাবার প্রতি আমার যদি কর্তব্য থাকে, তাহালে তাঁর প্রতি তোমার কি কোন কর্তব্য নেই?

তারক বলে—ছেড়ে দাও আমার হাত। দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দেওয়া ছাড়া আর আমার কোন কর্তব্য নেই। ছেড়ে দাও আমার হাত।—প্রবল ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয় তারক। আচমকা বেগ সহ্য কোরতে না পেরে রমা গড়িয়ে পড়ে যায় রাস্তার পাশের ঢালু জমিতে। রমার মুখ দিয়ে শুধু বার হয়—উঃ।

আমি কঠিন—আমি শক্ত। তারক বলে—আমি ধূমকেতুর গতিতে পথের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ছিন্ন কোরে এগিয়ে যাব—এগিয়ে যাব।

নৈশ্য অন্ধকারে দুজনে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ষ্টুডিওর একটা ঘরে বসে তারক আর শিবশংকর কথা বোলছিল। ঘরে প্রবেশ করে চিত্র অভিনেত্রী বনানী দেবী। মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। তারকের বইয়ের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় কোরছে।

বনানী ব্যস্ত ভাবে বলে—এই যে শিবশংকর বাবু! আপনি এখানে আর আমি এদিকে...

খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু কেন বলুন ত?

ভুলে গেছেন ত? আজ আমাদের...

ওহো! মনে পড়েছে শিবশংকর বলে।—আজ আমাদের ডায়মণ্ড-হারবার রোডে মোটর ট্রিপ দেবার প্রোগ্রাম ছিল। চলুন।

তারকবাবু। যাবেন নাকি? বনানী জিজ্ঞাসা করে।

মাপ কোরবেন—আমার একটু কাজ আছে।

দূর, তোর আবার কাজ! শিবশংকর তারককে টেনে তুলতে যায়।

না ভাই, সত্যই আমার কাজ আছে।

তোর চিরকালটা একভাবে গেল।

তারক কিছু বলে না, শুধু একটু মুচকে হাসে।

তা হোলে তুই যাবি না?

তুই দিন দিন একটা গাধা হোচ্ছিস, শিবু।—তারক বলে।—বনানী দেবী, কিছু মনে কোরবেন না—সত্যই আমার কাজ আছে।

আচ্ছা, ভাই, তোর কাজ তুই কর। আমরা চলি।

বনানী আর শিবশংকর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

তারক একবার ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে টেবিলের কলিং বেলটা টিপে দেয়। বেয়ারা প্রবেশ করে।

ডিরেক্টার সাব চলা গয়া?

জী হুজুর।

আচ্ছা, তোম যাও।

তারক কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে কি ভাবে। পুনরায় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে। ঘরে একটি তরুণ প্রবেশ করে।

আপনি? তারক জিজ্ঞাসা করে।

মানুষ। তরুণটি উত্তর দেয়।

ওরা পরস্পর পরস্পরকে সাংকেতিক চিহ্ন দেখায়। তারক তরুণকে বোসতে বলে। তারপর ড্রয়ার থেকে খামে মোড়া একটি লেফাপা তরুণটির হাতে দেয়। সে লেফাপাটি পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ায় এবং একটি ক্ষুদ্র নমস্কার কোরে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। তারকও স্টুডিও থেকে বেরিয়ে বাড়ীর পথ ধরে।

বাড়ী ঢুকতেই দেখে বাইরের ঘরে মালতীর বাবা হরিচরণবাবু বসে রয়েছেন।

কাকাবাবু, আপনি?

বিশেষ কিছু নয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা কোরতে এলাম।

বলুন।

এই বোলছিলাম কি এক বছর ত কেটে গেল, তা এইবার একটা দিন স্থির কোরে বিয়েটা হয়ে গেলে ভাল হয় না?

হ্যাঁ, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে একটা কথা বোলছিলাম যে, যদি দু তিন মাস অপেক্ষা করেন তাহোলে আমার পক্ষে একটু সুবিধা হয়।

কেন?

আপনি ত জানেন, আমার একটা বইয়ের ছবি তোলা হচ্ছে। আর দুএক মাসের মধ্যেই ছবি তোলা শেষ হয়ে যাবে। সেই জন্য আজকাল আমি ভীষণ ব্যস্ত আছি।

ওঃ। কিন্তু মালতীর মা বিয়ের জন্যও অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছেন।

কাকীমাকে আমার কাজের কথা বুঝিয়ে বোলবেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। তবে এটা জেনে রাখবেন যে মালতীকে বিয়ে আমি কোরবই।

আচ্ছা বাবা, তাই হবে। এখন আমি চলি।

আসুন, কাকাবাবু।

হরিচরণবাবু চলে যান, তারক ওপরের ঘরে এসে বসে।

তারকবাবু আছেন?—নীচে থেকে কে ডাকে; আছেন—বোলে তারক নেমে আসে। একটি খদ্দরপরা গৌরবর্ণ তরুণ তারককে নমস্কার কোরে তারকের হাতে একখানি চিঠি দেয়। তারক সেখানি পড়ে।

শ্রীচরণেষু,

দাদা, তুমি যাবার পর থেকে বাবা শয্যাশায়ী। এখন তাঁর শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে। তুমি একবার এস। বাবা তোমাকে

দেখবার জন্য বড় উতলা হয়েছেন। তাঁর এই শেষ অনুরোধ রেখো। তোমাকে এখানে থাকবার জন্য ডাকছিনা—তুমি এক দিনের জন্য কিংবা কয়েক ঘণ্টার জন্যও এস। যদি আসবার ইচ্ছা হয় তাহোলে চিঠি পাওয়া মাত্রই এস। দেরি হোলে হয় ত...

আমার প্রণাম নিও।

রমা

চিঠি পড়ে তারক অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে—

আপনি যাবেন কি?

অ্যাঁ—তারক স্বাভাবিক ভাবে বলে—আপনার পরিচয়টা ত পেলাম না।

আমি ঐ গাঁয়েরই ছেলে। আমার নাম শান্তিদেব।

ও, আমি যখন ওখানে ছিলাম তখন ত আপনাকে দেখিনি।

কি কোরে দেখবেন বলুন? আপনি ত সব সময় থাকতেন বাড়ীর মধ্যে; তাছাড়া ঐ সময় আমিও একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

আচ্ছা, ওখানে যাবার কটায় ট্রেন আছে বোলতে পারেন।

শান্তিদেব বলে—রাত সাড়ে আটটায় একটা ট্রেন আছে। তাড়াতাড়ি গেলে এই ট্রেনটা ধরা যায়।

তাই নাকি।

তারক রামুকে ডেকে বলে—রামু, আমি এখুনি দেশে যাচ্ছি—কাকা বাবুর খুব অসুখ। কবে ফিরবো ঠিক নেই।

আমিও যাব, ছোটবাবু। রামু বলে। দেশে আমি কখনও যাই নি।

পরে যাস, বুঝলি। চলুন শান্তিদেববাবু।

শিবশংকর চিঠি লিখছিল।

সুমিত্রা দেবী।

এইমাত্র দার্জিলিং থেকে আপনার চিঠি পেলাম, বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আট দশ দিন স্টুডিওতে কাজের বড় চাপ পড়েছে—তাই আপনার বাড়ীতে যেতে পারিনি। ভাবছিলাম আজই যাব। কিন্তু যেতে আর হোলো না। একটা ব্যাপার আমার আশ্চর্য লাগছে যে মিস্টার রায় ত একদিনও আমাকে আপনার দার্জিলিং যাওয়া সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। সে যা হোক। লিখেছেন আপনি আপনার এক বন্ধুর বাড়ীতে উঠেছেন। বন্ধুটি কেমন? তাঁর সঙ্গে আমার কি পরিচয় নেই।

তারকের কথা জানতে চেয়েছেন। কিন্তু তার বিষয়ে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। দিন কয়েক সে স্টুডিওতে না আসাতে কাল আমি তার বাড়ী গিয়ে রামুর কাছে জানতে পারি সে হঠাৎ তার দেশের বাড়ীতে গেছে। তার কাকাবাবুর নাকি খুব বেশি অসুখ। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, আপনি কোরেছেন কিনা জানি না। তারকের চালচলন কেমন যেন সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। সে বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। তার এই পরিবর্তনের কথা তাকে জিজ্ঞাসা কোরলেই সে হেসে উড়িয়ে দেয়। আপনি ভাববেন না যে তার প্রতি আমার ভালবাসার পরিমাণ বিন্দু মাত্র কমেছে। তারককে আমি ভালবাসি বোলেই তার মনের অবস্থা জানবার জন্য আমি সচেষ্ট। বহুকাল ধরে তাকে আমি দেখে আসছি। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারক নিশ্চয়ই কোন জটিল ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত হয়েছে—তা স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক। গোপন করার স্বভাব তার কোন দিনই ছিল না। অন্তত আমার কাছে ত কোরতই না। তাই ভাবছি কি করা যায়?

আমাদের এখানে হঠাৎ যে স্বদেশিকতার ঢেউ এসেছে তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের যে তিনজন অফিসারের দিল্লীর লাল কেল্লায় বিচার হোচ্ছে, তাঁদের মুক্তির জন্য এখানে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। তাই ভাবছি, যে বাংলা এই কিছু দিন আগে ৫০-এর

মন্বন্তরে ছারখার হয়ে গেছে। সেই বাংলায় আজ এত দ্রুত কি কোরে এল এই দারুণ উচ্ছ্বাস। আজ দিক্ থেকে দিগন্তে ধ্বনিত হোচ্ছে নোতুন শ্লোগান দিল্লী চলো—জয় হিন্দ্। দেশের জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে আজ চীৎকার কোরে দাবী কোরছে ভারতের মুক্তি বাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি। মৃত্যুপথযাত্রী নির্জীব ভারতবাসী। আজ পরের আশায় দিন না কাটিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে দেশের স্বাধীনতার জন্য।

এমন একদিন ছিল যখন সুভাষচন্দ্রের নাম কেউ কোরতো না। অনেক সুবিধাবাদী দল সুভাষকে বিশ্বাসঘাতকও বোলেছিলেন। কিন্তু আজ সারা ভারতবাসীর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে সুভাষের অদ্ভুত সংগঠনের পরিচয়। অদ্ভুত দেশ প্রেম। আজ ভারতবাসী সুভাষকে মেনে নিয়েছে নেতাজী। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য আমাদের দেশের নেতারা দীর্ঘ বৎসর ধরে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা কোরেই চলে ছিলেন। দেশের মধ্য থেকে নেতারা যা কোরতে পারেননি ভারতের বাইরে নেতাজী তাই কোরেছেন। তিনি প্রমাণ কোরে দিয়েছেন—ঐক্য সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আসে। আজ দেশের বহুলোক কংগ্রেসের অহিংস মতবাদের উপর সন্দেহাকুল হয়ে পড়েছে। তবে এটা ঠিক যে হিংসা কিংবা অহিংসা—যে কোন রূপেই হোক ভারতের স্বাধীনতা অতি শীঘ্রই অর্জিত হবে।

ভেতরে আসতে পারি ?—দরজার ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

নিশ্চয়ই। শিবশংকর ফিরে তাকায়। প্রবেশ করে বনানী।

অসময়ে এসে কাজে বাধা দিলাম বলে মনে হচ্ছে।

না, বাধা আর কি। শিবশংকর কাগজ কলম ড্রয়ারে রেখে দেয়। —বসুন।

বনানী বসে না। দূরে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

কাকে চিঠি লিখছিলেন ? বনানী প্রশ্ন করে।

সুমিত্রা দেবীকে।

ও। তিনি কি এখানে নেই ?

না—দার্জিলিংএ গেছেন।

বিরহী যক্ষ!

না, বনানী দেবী। আপনি যা ভাবছেন তা নয়।

আমার কাছে মিথ্যা লুকোচ্ছেন, শিববাবু। আপনি সুমিত্রা দেবীকে ভালবাসেন।

না।

কেন ?

কারণ আমি জানি, সুমিত্রাদেবী ভাল বাসেন অন্য জনকে।

কে তিনি ?

নাই বা জানলেন। পরের বিষয় জানবার জন্য এত কৌতূহল কেন।

এটা আমাদের স্বভাব।

শিবশংকর বলে—আপনি কি কাউকে ভালবাসেন ?

কেন, আমাদের কি ভালবাসতে নেই ?

সে কথা আমি বলিনি।

আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।—বনানী বলে।

আমিও ত আমার প্রশ্নের উত্তর দাবী কোরতে পারি। প্রথম প্রশ্ন আমার।

আপনার প্রশ্নের উত্তর দিলে আপনি আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেবেন ত ?

নিশ্চয়ই। সুমিত্রা ভালবাসে তারককে।

তারকবাবুও কি সুমিত্রাকে ভাল বাসেন ?

তা আমি জানিনা। এবার আমার কথার জবাব দিন।

বনানী বলে—আমি কাউকে ভাল বাসি না।

তার প্রমাণ ?

প্রমাণ আবার কি। ভালবাসার অভিনয় কোরে কোরে ভালবাসতে আর ইচ্ছা হয় না। তাছাড়া ও আমাদের ধাতে সয় না।

কেন ? আজকাল ত অনেক অভিনেত্রী বিয়ে কোরছেন।

হ্যাঁ, আবার ডাইভোর্স ও কোরছেন।

আচ্ছা, সকলের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। আপনার নিজের কথা বলুন।

আমি কি সকলের থেকে ছাড়া ?

আপনার সঙ্গে তর্কে পেরে ওঠা ভার। আপনি কি কিছুতেই ধরা দেবে না ?

ধরা দিলেই কি সকলে ধরতে পারে ?

সকলে না পারুক একজনও ত পারে।

সে আশা বৃথা।

কারণ ?

আজকালকার ছেলেরা বড় ভীতু।

প্রমাণ ?

আপনি।

তার মানে ?

কিছু নয়। হঠাৎ হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বনানী বলে—ইস্। বেলা হয়ে গেছে। আমাকে এখুনি একজায়গায় যেতে হবে। বনানী উঠে দাঁড়ায়।

শিবশংকর বলে—আপনি যেতে চাইছেন, যান। তবে ভীরুতার অপবাদই দিয়ে গেলেন। তার খণ্ডনের কোন সুযোগই আমাকে দিলেন না।

সুযোগ পেয়েও যারা বলে সুযোগ পেলাম না, তাদের মত নির্বোধ আর কে আছে ?

এ ভুল আপনার আমি ভেঙ্গে দিতে পারি।

সেই আশায় রইলাম। বনানী দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

শুনুন। —পেছন থেকে শিবশংকর বলে—বর্তমানকে অস্বীকার কোরে ভবিষ্যতের আশায় আমি থাকতে রাজি নই। শিবশংকর বনানীর

হাত চেপে ধরে। বনানী বলে—নেশা কেটে গেলেই এই হাত ঘৃণায় দূরে ঠেলে ফেলে দেবেন ত?

চকিতে শিবশংকর বনানীর হাত ছেড়ে দিয়ে বলে—নমস্কার। বনানী একটু মুচকী হেসে প্রতিনমস্কার কোরে দ্রুত পদে চলে যায়।

ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে ধনপতিবাবু বলেন—তারক, তুমি এসেছ এতে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি। আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না। তাই বেঁচে থাকতে থাকতেই আমার কর্ত্তব্য আমি কোরে যেতে চাই। উইলে আমি তোমার নামে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি লিখে দিয়েছি। এখন তুমি…

তারক বলে—সম্পত্তির প্রতি মোহ আমার ভেঙে গেছে।

ধনপতিবাবু বলেন—হয়ত তাই। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমি কোরলাম, এইবার তোমার কর্ত্তব্য তুমি কোরবে।

তারক বলে—তাছাড়া সমস্ত সম্পত্তির মালিক ত আমি হোতে পারি না।

তোরা কি চিরদিনই আমাকে ভুল বুঝে যাবি। তোর মাও একদিন আমাকে কি নিদারুণ ভুল বুঝেই ত চলে যায়। বোলতে পারিস—এমন কি অপরাধ করেছি যে, যার জন্য চিরজীবন, এই মরণের সন্ধিক্ষণে বসেও সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কোরতে পারছি না। ওরে তারক, কেন তুই ভুলে যাচ্ছিস যে তুই আমারই ছেলে।

কিন্তু রমা?

হিন্দুধর্মে ছেলেরাই সম্পত্তি পায়।

রমাকে বঞ্চিত করবার কোন অধিকার আপনার নাই।

পুত্রকেও আমি বঞ্চিত করতে পারি না।

বেশ! এই উইল আমি ছিঁড়ে ফেলবো। তারক উইলখানা টুকরো টুকরো কোরে ছিঁড়ে ফেলে।

উইলের কপি উকিলের কাছে আছে।

আমি রমার নামে সমস্ত বিষয় লিখে দেবো।

দিও। তোমার সম্পত্তি যা ইচ্ছা তাই কোরো।

সম্পত্তি! অকস্মাৎ তারক রেগে ওঠে। বছরের পর বছর হাজার হাজার দরিদ্র চাষীকে বঞ্চিত করে সে সম্পত্তিকে আমি ঘৃণা করি। আমি কিছু চাই না—কিছু চাই না।

রমা এতক্ষণ চুপ কোরে বসেছিল। সে বলে—দাদা। উত্তেজিত হোচ্ছ কেন? যে নিয়ম ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এতদিন সমাজ গড়ে উঠেছিল সেই সমাজ ব্যবস্থাকেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা মেনে নিয়েছিলেন। তাতে তাঁরা ত কোন অন্যায়ই করেননি। বরং না মেনে নিলেই হোতো অনিয়ম। সুতরাং এই সম্পত্তিকে ভগবানের দান বোলেই মেনে নেওয়া উচিত। তাছাড়া আমাদের বংশের কেউ কখনও কাউকে উৎপীড়ন করেননি। দাতা বোলে তাঁদের নাম এখনও আছে। আজও কখনও কারো ওপর জোর কোরে খাজনা আদায় হয় না। অজন্মায় খাজনা মকুব কোরে প্রজাদের বিনা মূল্যে দেওয়া হয় শস্য। পানীয় জলের জন্য কোরে দেওয়া হয়েছে সুন্দর পুষ্করিণী, ভাল ভাল নলকূপ। গত দুর্ভিক্ষে আমাদের গোলার সমস্ত রক্ষিত ধান বিলি করা হয়েছে গ্রামবাসীদের।

তারক বলে—তাদেরই ধন ছলে কেড়ে নিয়ে, তাদেরই দয়া কোরে দানের ছলে ঘুস দিয়ে দাতা সাজা—এই ত?

তোমার মত কি সারা পৃথিবী মেনে নিয়েছে?

একদিন মেনে নিতে বাধ্য হবে। আর সেদিন খুব দূরে নয়।

সেদিনের দিকে তাকিয়ে তুমি স্বপ্নই দেখো।

শুধু স্বপ্ন দেখি না বোন,—সেদিন আনবার জন্য এই অলীক বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোরে চলেছি যুদ্ধ।

জয় কিংবা পরাজয়ের আশায় রইলাম। এখন এস, অনেক রাত হয়েছে, খাবে এস।

ঝড়ের মত শান্তিদেব ঘরে প্রবেশ করে। বলে—তারকবাবু, এর একটা উপায় কোরতেই হবে।

কি ব্যাপার? শশব্যস্তে তারক উঠে দাঁড়ায়।

এইমাত্র খবর পেলাম যে বরপক্ষ আসবে না। তারা অন্য জায়গায় বেশি টাকা পেয়ে বিয়ে করতে গেছে।

কিছুই বুঝতে পারলাম না—তারক বলে।

রমা বলে—আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। শান্তিদার বাড়ীর কাছের বাড়ীতে একটি মেয়ের বিয়ে ছিল। আর···

থাক, আমি বুঝতে পেরেছি। —তারক বলে।

আপনাকে একটা উপায় কোরে দিতেই হবে, তারকদা। শান্তিদেব বলে।

আমি কি উপায় কোরবো?

আপনি মেয়েটিকে বিয়ে কোরে ধর্ম বাঁচান।

আপনি কি পাগল হয়েছেন?

রমা বলে—হ্যাঁ, দাদা। তুমি ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করো। মেয়েটি খুব ভাল। আমি তাকে চিনি। তাছাড়া গরীব বিধবার মেয়ে। একে তোমরা যদি না রক্ষা করো ত কে কোরবে?

আমি বিয়ে কোরতে পারবো না। তারক বলে—শান্তিদেববাবু আপনি বিয়ে করুন।

আমাদের সঙ্গে একটু সম্বন্ধ আছে।

ওঃ!

তারক, শয্যা থেকে ধনপতিবাবু ডাকেন।

কি বোলছেন?

আমার অনুরোধ, তারক। ধনপতিবাবু বলেন—শেষ অনুরোধ তুই ঐ মেয়েটিকে বিয়ে কোরে ঘরে নিয়ে আয়।

আপনি বুঝতে পারছেন না, কাকাবাবু।

এতে বোঝাবুঝির কি আছে? দেশের কাজে নেমেছ—একটি

বিধবার কন্যাকে সমাজচ্যুতি, জাতিচ্যুতি থেকে রক্ষা করাটা কি তোমাদের ধর্ম নয় ?

কিন্তু ওরা কেন জাতিচ্যুত হবে ? ওদের ত কোন দোষ নেই।

এই দেশাচার।

এ আমি মানি না।

তোমার মানা-না-মানার ওপর কিছু এসে যায় না। তুমি চলে যাবে শহরে, কিন্তু এদের থাকতে হবে গাঁয়েই চিরজীবন। বুঝে দেখো, কেউ এদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। এদের হাতে কেউ একবিন্দু জলও পান কোরবে না। কেউ মারা গেলে শব নিয়ে যাবার লোক পাওয়া যাবে না। পরকালের কথা না হয় আমি ছেড়েই দিলাম; কিন্তু ইহকাল ওদের কাছে হয়ে থাকবে একটা ভীষণ মরুভূমির মত।

তারক বলে—আমি ছাড়া কি অন্য কেউ নেই ?

শান্তিদেব বলে—না।

রমা বলে, যাও দাদা, আর দেরী কোরো না। হয়ত লগ্নের সময় বয়ে যাচ্ছে।

আসুন, তারকদা।

তারক দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলে—কিন্তু আমি···

কোন কিছু শুনতে চাই না—রমা বলে।

তোরা বুঝতে পারছিস না আমার অবস্থা। আমি···

কিছু বুঝতে চাই না, এস।

রমা আর শান্তিদেব তারককে টানতে টানতে ঘর থেকে নিয়ে চলে যায়।

প্রসন্ন হাসিতে ধনপতিবাবুর মুখ ভরে ওঠে।

স্বপ্নের মত মনে হয় তারকের সমস্ত ঘটনাটা। কি অভাবনীয় ভাবেই না তারকের জীবনের গতি হঠাৎ অন্য খাদে বেঁকে গেল। এ কি হোলো ? মালতীকে সে কেমন কোরে মুখ দেখাবে ? সে কি তাকে ক্ষমা কোরবে ? মালতীর কি হবে ?

গরীবের বাড়ী বিয়ে তাই বেশি লোকের সমাগম হয়নি। তাও-যে কয়জন এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই বিয়ে হবে না মনে কোরে আগেই চলে গেছে। বাকি দু-একজন যেমন শান্তি, রমা—তারাও চলে গেছে একে একে।

একটু আগে শ্বশ্রূমাতা তারককে অজস্র আশীর্বাদ কোরে বিশ্রাম কোরতে বোলে প্রস্থান কোরেছেন। বাসর ঘরে নোতুন বধূর পাশে বসে তারক উজ্জ্বল আলোটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল—তার নিজের কথা, সে কি আদর্শবান্ হোলো না আদর্শচ্যুত হোলো। ভেবে কোন কূলকিনারা পায় না। হঠাৎ আলোটা বার কয়েক দপ্ দপ্ কোরে নিভে গেল। গাঢ় অন্ধকারে ঘর ভরে গেল। এই ঘন অন্ধকার তারকের বুকে পাষাণের মত ভারী বোধ হোতে লাগলো। তার যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হোতে লাগলো। একি! তারকের সারা দেহ অবশ হয়ে আসে।…

ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে তারক চোখ মেলে তাকায়। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, তবু সে বুঝতে পারে, কার কোলে সে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। আর কে যেন তার চোখেমুখে বুলিয়ে দিচ্ছে শীতল জলে ভেজা কাপড়…বাতাস কোরছে ধীরে ধীরে।

কে তুমি?

কোন উত্তর নাই।

কে তুমি?

আমি। মৃদুকণ্ঠে ছোট্ট উত্তর আসে।

ও। —তারকের মনে পড়ে যায় কিছুক্ষণ পূর্বের সব ঘটনা। বুঝতে পারে এ তার নববিবাহিতা স্ত্রী।

তোমার নাম? —তারক জিজ্ঞাসা করে।

রাণু।

ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। তারক মেয়েটির কোল থেকে মাথাটা নামিয়ে নিয়ে একটা বালিসের ওপর রাখে। চোখ বুজে সে

ঘুমোবার চেষ্টা করে, ঘুম কিন্তু আসে না। মেয়েটি চুপ কোরে বসে থাকে।

তারক বলে—শুয়ে পড়ো। সে দ্বিরুক্তি না কোরে শুয়ে পড়ে।

নাঃ, ঘুম হবে না। তারক উঠে বসে।

আকাশ তারায় তারায় ভরে গেছে। ঘরের প্রায় সমস্ত জিনিষ তারার আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি বেশ ঘুমোচ্ছে। রাত এখন কটা কে জানে। তারক উঠে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

দাঁড়ান।—চমকে তারক পেছন ফেরে।

মেয়েটি বলে—আপনাকে ধরে রাখতে পারবো না, তা আমি জানি। বোলেই সে তারককে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে। ঘর থেকে তারক বেরিয়ে যায়। দ্রুতপদে সে অন্ধকার পথ অতিক্রম করে। পশ্চাৎ ফিরলে সে দেখতে পেতো দুখানি সজল আঁখি।

কে যায়? গম্ভীর গলায় দূর থেকে প্রশ্ন আসে। তারক কোন জবাব দেয় না। সে এগিয়ে চলে। একটা ছায়ামূর্তি দ্রুতবেগে তারকের কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে—কে তুমি?

বিরক্ত হয়ে তারক প্রশ্ন করে—তুমি কে?

একি! তারকদা। ছায়ামূর্তি বলে।

হ্যাঁ, শান্তিদেববাবু।

কোথায় চলেছেন?

কোলকাতায়।

বৌদিকে কি পছন্দ হয়নি, তারকদা?

এ প্রশ্ন এখন অবান্তর।

বৌদি জানেন, আপনি চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

একটা কথা জিজ্ঞাসা কোরবো?

করুন।

মেয়েরা কি দেশের কাজে বাধা ?

অনেক সময়েই।

বৌদি বাধা দেবেন, কি কোরে আপনি বুঝলেন ?

বাধা না দিলেও, ভারস্বরূপ এ কথা আপনি অস্বীকার কোরতে পারেন না।

ভার মনে না কোরে সহকর্মিণী কোরে নিন না।

সে আশা দুরাশা। তাহোলে আজই তিনি আমার সঙ্গে জোর কোরে চলে আসতে পারতেন। তা ছাড়া বিপ্লবের পথে প্রেম, ভালবাসার স্থান নেই।

বুঝেছি।—শান্তিদেব বলে। রাশিয়ার মতবাদের সমর্থক আপনি।

ভুল কোরলেন। রাশিয়ার মতবাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। মার্ক্সবাদের ওপর ভিত্তি কোরেই আমাদের সংগ্রাম।

বিদেশী মতবাদের ওপর আস্থা না রেখে স্বদেশী কোন মতবাদ গ্রহণ কোরতে পারেন না কি ? ভারতের সনাতন সত্যের ওপর ভিত্তি কোরে যে অহিংসবাদ—তা কি গ্রহণযোগ্য নয়।

তর্কের সময় এখন নয়। তবু বোলছি, কোন মতবাদ কোন দেশের নিজস্ব সম্পদ্ হোতে পারে না ; কারণ সত্য মতবাদের ওপর পৃথিবীর সকল স্থানের লোকেরই আস্থা আছে। বর্তমান পৃথিবীতে হিংসার হাত হোতে মুক্তি পাবার জন্য অহিংসবাদই একমাত্র উপায়।

মার্ক্সবাদও শুধু যে হিংসা থেকেই বিরত তা নয়, সে মতবাদ কোন রকম বৈষম্যই পছন্দ করে না।

বৈষম্যই প্রকৃতির নিয়ম, তবে সর্বভূতে দয়া—এ কথাটা মানি।

তারক বলে—দয়া নয়—সমান। যাক এসব কথা কাটাকাটি। আপনি এই রাত্রে বেরিয়েছেন কেন ?

রাত্রি কোথায় ?—শান্তিদেব বলে, ঐ দেখুন ওদিকে আকাশ লাল হয়ে গেছে। একটু পরেই সূর্য উঠবে। আমি প্রাতঃভ্রমণে বার হয়েছি।

দুজনে নিঃশব্দে পথ চলে।

তারক বলে—আপনি নিয়মিত চরকা কাটেন ?

হ্যাঁ, দেশের সবাই যদি চরকা কাটতো তা হোলে আজ কাপড়ের জন্য এত কষ্ট হোতো না। চরকাই ভারতের স্বাধীনতার প্রতীক।

তা হোলে সবাই ঢেঁকি ব্যবহার কোরলে গত ৫০-এর মন্বন্তর হোতো না ?

প্রশ্নের ছলে আমাকে কি আপনি বক্রোক্তি কোরছেন ? তবে এটা ঠিক, যন্ত্র মানবকে পঙ্গু করে। চরকা মানে কুটীরশিল্প মানুষকে স্বাবলম্বী করে।

আপনি নিশ্চয়ই জেল-ফেরতা।

হ্যাঁ, বার চারেক জেলে গেছি। আমি এই জেলার কংগ্রেস-সম্পাদক।

তারক বলে—শান্তিদেব নাম আপনার সার্থক।

আশীর্বাদ করুন, তারকদা, আমি যেন আদর্শচ্যুত না হই।

আমার আশীর্বাদের কোন মূল্যই নেই। আপনার মনের দৃঢ়তাই আপনাকে আদর্শ দেশনেতা কোরে গড়ে তুলবে।

নেতা হোতে আমি চাই না। আমি কর্মী,—কর্মীর মতই থাকতে চাই।

কেন, নেতারা কি কর্মী নন ?

সে কথা আমি বলিনি। যাক। এইবার আমি বিদায় নেবো। আশা করি, আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

নিশ্চয়ই।

জয় হিন্দ !

প্রত্যুত্তরে তারক হেসে বলে—

জয় হিন্দ্ !

শান্তিদেব উল্টো পথে বিদায় নেয়। তারক সামনের পথ ধরে।

পূর্বাকাশে তখন নানা রঙের কাড়াকাড়ি লেগে গেছে। প্রভাতসূর্য উঠতে আর দেরি নেই।

সুটিং পুরোদমেই চলেছে। বাগানের গাছতলায় একটা বেঞ্চির ওপর শিবশংকর আর বনানী বসে সময় কাটাবার ছলে কথা কইতেছিল। সেদিন বিকালের ঘটনা সম্বন্ধে কেউ কোন উল্লেখ কোন দিনই করে নি। যেন সেদিন কিছুই হয়নি।

শিবশংকর বলে—আপনি যে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিসে বুঝলেন ?

নানা কারণে আমার কাছে প্রমাণিত হয়েছে। দেখছেন পাখী দুটো কেমন বসে আছে।

হুঁ। আপনার বন্ধু তারকবাবুর খবর কি ?

আজ এসেছে। বড় গম্ভীর বোলে বোধ হোলো। চুপচাপ নিজের ঘরে বসে আছে।

আপনার সঙ্গে কোন কথা হয়নি ?

হয়েছে দু'একটা। জিজ্ঞাসা কোরলাম কাকাবাবু কেমন আছেন। উত্তর হোলো সংক্ষেপে 'ভাল'।—আর খবর কি ? আরো সংক্ষেপে উত্তর এল 'মন্দ নয়'। যে কথাই জিজ্ঞাসা করি ঐ রকম ছোট জবাব। একতরফা আর কতক্ষণ বা চলে। চলে এলাম।

চলুন, তারকবাবুর সঙ্গে দেখা কোরে আসি।

আপনি যান, আমি এখানে আছি।

বন্ধুর ওপর রাগ হয়েছে নাকি ?

না।

অভিমান ?

না।

তবে ?

কিছু না।—শিবশংকর বলে। আপনার কাছে একটা অনুরোধ কোরবো ?

করুন।

আপনি তারকবাবুর সঙ্গে কিছু দিনের জন্য কি প্রেমের অভিনয় কোরতে পারেন ?

এরূপ অনুরোধের মানে ?

আপনি অভিনেত্রী বলেই এই অনুরোধ কোরতে পেরেছি।

এতে আপনার লাভ ?

বিশেষ কিছু নয়—একটু আনন্দ।

অভিনয় যদি সত্যে পরিণত হয়।

সে সম্ভাবনা নেই।

তবে ? মিছামিছি অহেতুক এই খেলা।

বোলেছি ত, নিছক আনন্দেরই জন্য। আপনি রাজি কিনা বলুন।

বনানী বলে—কিন্তু তারকবাবুর মত আদর্শবান্ লোকের সঙ্গে এই রকম অন্যায় কৌতুক কি উচিত হবে ? তা ছাড়া উনি যে রকম গম্ভীর তাতে প্রেম জমে না। আমি বুঝতে পারছি, ওঁর দিক্ থেকে কোন রকম উৎসাহ-ই পাবো না।

কথার কি প্রয়োজন ; আপনি রাজি থাকেন ত বলুন।

আপনার অনুরোধ রক্ষার জন্যই আমি রাজি হোচ্ছি। বনানী দৃঢ়কণ্ঠে বলে।

শিবশংকর বলে—আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

ধন্যবাদের কোনই প্রয়োজন নেই। আপনার অনুরোধই আমার কাছে যথেষ্ট।

বনানী তারকের ঘরের দিকে অগ্রসর হয়। পর্দার অন্তরাল থেকে সে বলে—

ভেতরে আসতে পারি ?

তারক একটু সচকিত হয়ে ওঠে—নিশ্চয়ই। বনানী ঘরে ঢোকে।

আপনাকে বিরক্ত কোরতে এলাম না কি?

না না—এখন আমার কোন কাজ নেই। তারপর কি মনে কোরে? —বসুন, বসুন।

এলাম একটু গল্প কোরতে।

ওঃ।

দুজনে চুপচাপ। বনানী আড়চোখে তাকিয়ে দেখে তারক টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে একটা কাগজের ওপর হিজিবিজি কাটছে। মুখের ওপর কেমন যেন একটা দৃঢ়তা ভাব ফুটে উঠেছে। রুক্ষ চুলগুলো এলমেল ভাবে মাথার মধ্যে জড়ানো রয়েছে। কয়েক দিন দাড়ি না কামানোর জন্য দাড়িগুলো সারা মুখে খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে। জামা কাপড় বেশ ময়লা।

বনানী মৃদুকণ্ঠে ডাকে—তারকবাবু!

তারক অদ্ভুত চোখে বনানীর দিকে তাকায়।

সারাক্ষণ এত কি ভাবেন?

ভাবনার কি কিছু ঠিক আছে, বনানী দেবী।

আপনি কি কারু প্রেমে পড়েছেন?

প্রেম! হাঃ হাঃ হাঃ—অদ্ভুত ভাবে তারক হেসে ওঠে।—না, সেটুকু দুর্বলতা জয় আমি কোরেছি।

তবে?

সব কথার উত্তর কি সবাইকে দেওয়া যায়?

তা ঠিক। তবে প্রেমে পড়াটাকে দুর্বলতা বলেন আপনি!

হাঁ, শুধু দুর্বলতা নয়—অন্যায়। প্রেমে পড়া ছাড়া আমাদের দেশের ছেলেদের আরও অনেক বড় কাজ আছে—তা হোচ্ছে দেশসেবা।

প্রেমে পড়লে কি দেশসেবা করা যায় না?

না। দুটো কাজ একসঙ্গে হয় না।

আগে প্রেম কোরে তারপর ত দেশের কাজে নামা যায়।

প্রেম যে কোরতেই হবে—এর কি কোন মানে হয়। তারপর প্রেম যদি সফল হয়, তখন আর দুঃখকষ্ট সহ্য কোরে দেশসেবা কোরতে মন চায় না। দেশের দুঃখকষ্ট দূর করার চেয়ে তখন প্রেমাস্পদের মনের তুষ্টির জন্য—তার যাতে কোন রকম কষ্ট না হয়—সে যাতে সুখে থাকে সেই বিষয়েই বেশি সচেষ্ট হোতে হয়। অপর পক্ষে যদি প্রেম ব্যর্থ হয় তা হোলে ত কথাই নেই। সারা জীবন তার কাছে হয়ে থাকে মরুভূমির মত, কিছুতেই সে জোর পায় না। এ রকম অবস্থায় অনেকে দেশের কাজে নামে; কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এতে দেশমাতৃকার অবমাননা করা হয়।

বনানী বলে—কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশনেতা দেশের কাজের সঙ্গে সঙ্গে ভালবেসে বিয়ে কোরেছেন এবং বিবাহের পরও তাঁদের পূর্বের কাজ থেকে এতটুকু বিচ্যুতি ঘটে নি।

মহৎদের কথা ছেড়ে দিন। মহৎদের সঙ্গে সাধারণের তুলনা করা যায় না।

সাধারণের মধ্য থেকেই মহতের উৎপত্তি।

তা আমি অস্বীকার করি না। তবে মহৎ ব্যক্তির প্রতিভা থাকে, আর তারই জোরে তাঁরা দুরূহ কাজ সম্ভব করেন।

সাধারণের মধ্যে কার প্রতিভা আছে বা না আছে তা আপনি জানবেন কি কোরে?

তাই বোলে সকলেরই সকল কাজ কোরতে যাওয়াটা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মহতের জীবনের গতির সঙ্গে নিজেদের জীবন অনুসরণ করাটা ঠিক নয়। মহতের আদর্শ এবং পথই অনুসরণ করা উচিত।

ঘরের মধ্যে আবার নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। বনানী ভাবে, এ কার সঙ্গে সে অভিনয় কোরতে এসেছে। এই মানুষকে অভিনয় কোরে নয়—সত্যই ভালবাসতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই বিরাট বলিষ্ঠ

দৃষ্টিভঙ্গির কাছে ভালবাসা জানাতে সাহস হয় না। ভক্তিও নয়। শুধু দূর থেকে শ্রদ্ধাভরে মাথা নত হয়ে যায় আপনা থেকেই।

বনানী মৃদু কণ্ঠে বলে—আপনি মহৎ!

তারক বলে—নারী পুরুষের প্রশংসা তখনই করে যখন সে কিছু প্রত্যাশা করে।

আপনি ঠিকই বোলেছেন—সত্যিই আমি আপনার কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করি।

কিন্তু তা বিফল হবে। কারণ ব্যক্তিগত কারুর সুখের জন্য আমি কিছু কোরতে রাজি নই।

যদি বলি আপনি আমায় অপমান কোরছেন?

আমি তা অস্বীকার কোরে বোলবো—না, কেন-না যারা নিজেদের মানী মনে করে, তারাই অকারণে অপরকে অপমান করে আর সব সময়েই তারা মনে করে এই বুঝি কেউ তাকে অপমান কোরলো।

হেসে বনানী বলে—আপনি বেশ লোক যাহোক।

তারক বলে—আচ্ছা, এখন আমি উঠি, একবার নন্দিনীর ওখানে যাব।

আমাদের নোতুন অভিনেত্রী নন্দিনী দেবী?

হাঁ, তিনি আজ আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কোরেছেন।

তিনি ত স্টুডিওর বাসে অনেকক্ষণ চলে গেছেন।

তা জানি।

তাঁর সঙ্গে কি আগে আপনার পরিচয় ছিল?

না, এইখানেই কিছুদিনের পরিচয়।

বনানী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—আচ্ছা জয় হিন্দ।

জয় হিন্দ।

তারক পথ ধরে।

পথে বিচিত্র জনতা। তাদের আলাপ অলোচনাও বিচিত্র।—ট্রামে বাসের ধাক্কা ধাক্কি আর সহ্য করা যায় না।—খুঁজে খুঁজে হয়রান, সারা কোলকাতা সহরে একটা বাড়ী পাওয়া যায় না।—দেখছো ত হে, ভুলাভাই দেশাইয়ের জেরা, লেপ্টেন্যাণ্ট নাগ একেবারে কাবু।—এবারে যা ছাটাই আরম্ভ হবে।—কি লেকচার দিচ্ছেন পণ্ডিতজী!—না মনে হয় এবার বাজারের দর একটু নামবে।—এবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং কোলকাতাতেই হবে শুনছি।—ফ্লিম লাইনে 'উদয়ের পথে' যুগান্তর এনেছে।

অনেক ঘুরেফিরে তারক গলিটা পায়। পাড়াটা একেবারেই খারাপ। ১০ নং...১৫নং...এই বাড়ীটাই হবে। তারক দরজায় মৃদু আঘাত করে।

কে তারকবাবু? ভেতর থেকে প্রশ্ন আসে।

হাঁ,

দরজা খুলে যায়। নন্দিনী হাসি মুখে বলে—আসুন। সে তারককে রান্নাঘরে নিয়ে যায়।

জুতোখুলে এই পীড়ার ওপর বসুন।

তারক নীরবে নন্দিনীর আদেশ পালন করে।

দেখছেন ত আমার কতবড় বাড়ী। একটা বৈঠকখানা, একটা থাকবার ঘর, এই বারান্দা আর অর্ধেকটা ঘিরে এই রান্নাঘর।

আপনার এখানে আর কেউ থাকেন নাকি? —তারক জিজ্ঞাসা করে

না, আমি একাই থাকি। রান্নাঘরে আপনার কষ্ট হোচ্ছে না ত?

না, কষ্ট আর কি। বেশ বসে বসে গল্প করা যাবে।

সেই জন্যই ত আপনাকে এখানে বোসতে বোললাম। এখন বলুন ত আপনি কি ভালবাসেন—সিঙ্গাড়া, কচুরি না নিমকি?

আমি সবই ভালবাসি।

তার মানে সবই আপনার চাই। আপনি ত বড় ধূর্ত। আচ্ছা। তারকবাবু, আপনি একজন নীতিবাদীসম্পন্ন সাহিত্যিক হয়ে আমার মত একজন সামান্য মেয়ের ঘরে আসতে আপনার বিবেকে বাধলো না?

না।

যেখানে আজ আপনি এসেছেন, সেখানে বাস করে শুধু পতিতারা, আর আমরা অত্যন্ত নিম্নস্তরের পতিতা।

তারক বলে—আমরা বোলে আপনি যাদের কথা বোলছেন, তাদের সঙ্গে আপনার অনেক তফাৎ।

আমার মন জোগাবার জন্যই এ কথা আপনি বোলছেন।

কারো মনতুষ্টি করা আমার নিয়ম বিরুদ্ধ, আর আমাকে যদি সেই রকমই লোক ভেবে থাকেন, তা হোলে ভুল বুঝেছেন। আজ আমার মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তবু আপনি যখন আমাকে এখানে আসবার জন্য অনুরোধ কোরলেন, তখন আপনাকে আমি প্রত্যাখান কোরতে পারলাম না। কারণ আপনার মুখে, চোখে, সারা দেহে কেমন যেন একটা বিষাদ মাখানো আছে। আমার মনে হয়, আজ আপনি যেভাবে জীবন যাপন কোরছেন—এটা আপনার আসল রূপ নয়। আপনার মনের মধ্যে আছে একটি সরল স্বভাব সুন্দর ভাল মেয়ে। সেই মেয়েটির আসল রূপ এই বাড়ীতে পাবো বোলেই আজ আমার আগমন।

নন্দিনী আস্তে আস্তে বলে—আমার ধারণার অতীত আপনি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আপনি আমায় স্নেহ করেন তা আমি জানি। আর সেই স্নেহের দাবীতেই আজ আপনার মত মহৎ ব্যক্তিকে এখানে আসতে অনুরোধ কোরতে সাহস পেয়েছি।

নন্দিনী একটা প্লেটে কোরে গোটাকতক খাবার তারকের সামনে এগিয়ে দেয়।

কচুরিগুলো খান, ততখন আমি সিঙাড়া ভাজি—নন্দিনী কড়ায় খুন্তি চালাতে চালাতে বলে।

তারক খেতে খেতে বলে—সন্দেশগুলি ত বেশ সুন্দর। এও কি আপনার হাতের তৈরী ?

সলজ্জ কণ্ঠে নন্দিনী বলে—হাঁ। সব খাবারই আমার হাতে তৈরী।

বলেন কি! এই এত রকম খাবার তৈরী কোরতে আপনি জানেন? ভালই হোল, এবারে মাঝে মাঝে এখানে এসে মুখ বদলানো যাবে।

সেত আমার সৌভাগ্য। আচ্ছা, বাড়ীতে আপনার কে আছেন?

কেউ নেই, এক রামু ছাড়া।

রামু কে?

অনেক দিনের পুরনো চাকর।

তা হোলে রান্না করে কে?

ওই করে।

ও, তা হোলে এটা আপনার বাসা বাড়ী। দেশের বাড়ীতে কে আছেন?

কেউ নেই।

তাকি হয় নাকি?

কেন হবে না। আমার মনে হয়, আপনারও কেউ নেই।

কিন্তু কপাল দোষে আমার নিজের জন্যই আজ আমার আত্মীয় থাকতেও নেই। কারণ আমি পতিতা।

আমিও পতিত।

আপনি কি বোলছেন!

আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যে কারণে আপনি সমাজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন, সে কারণে আমার নয় তা আমি জানি, তবে সমাজের অন্য বিশেষ ব্যবস্থার জন্য আমি স্বেচ্ছায় সমাজ ত্যাগ কোরেছি। আজও যেটুকু আমার সমাজের সঙ্গে আছে সম্বন্ধ, আমাকে তাও অতি শীঘ্র ছেদ কোরতে হবে।

নন্দিনী জিজ্ঞাসা করে—কোলকাতায় সমাজ কোথায়?

সমাজ নেই ঠিক, তবে এখানে আছে সোসাইটি।

হঠাৎ নন্দিনীর লক্ষ্য পড়ে তারকের খাবার প্লেটের ওপর। ব্যস্ত হয়ে নন্দিনী বলে ওকি! খান। হাতগুটিয়ে বসে আছেন যে।

আর খেতে পারছি না।

তা হবে না—আপনাকে সব খেতে হবে।

বিশ্বাস করুন, আর আমি খেতে পারছি না।

তবে এই সিঙাড়া দুটো খান।

দুটো নয়, একটা খাচ্ছি।

নন্দিনী মুখ ভার করে বলে—আপনি ভারি ইয়ে……

হেসে তারক বলে—তা যা বোলেছেন।

খাওয়ার পর তারক বলে—

এবার তা হোলে আমি যাই।

একমুখ হেসে নন্দিনী বলে—'যাই' বোলতে নেই—আসুন। দাঁড়ান, আলোটা ধরছি।

নন্দিনী লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে হঠাৎ বলে—আচ্ছা তারকবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এপথ থেকে কোনদিনই কি আমি মুক্তি পাবো না?

স্বেচ্ছায় যে পথে এসেছেন…

স্বেচ্ছায়! নন্দিনী অশ্রুভারাক্রান্ত স্বরে বলে—কিন্তু ঠিক এপথে ত আমি স্বেচ্ছায় আসিনি।

তা'হলে ঘটনার চক্রে।

হাঁ। একদিন সংসারের লোভে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিলাম বিধবা আমি……

বাধা দিয়ে তারক বলে—ওসব কথায় প্রয়োজন কি?

নন্দিনী অনুনয়ের সুরে বলে—কাউকে জানাতে পারি না আমার মনের কথা। আপনি আজ শুনে জান আমার সব কথা, যে কথা শোনাবার জন্য আমার প্রাণ মন হাঁপিয়ে উঠেছে।

কারুর মনের কথা শুনতে আমি আসিনি।

নন্দিনী দৃঢ় কণ্ঠে বলে—আপনাকে শুনতেই হবে।

তাতে আপনার লাভ?

লাভ আমার আছে। মনের কথা আপনাকে জানিয়ে আমার বুকের পাষাণ ভার একটু লাঘব কোরতে চাই।

নন্দিনী দুয়ার বন্ধ কোরে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে—মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়ীর আমি ছিলাম বিধবা মেয়ে। দিনরাত ঝিয়ের মত সংসারের সমস্ত কাজ কোরতাম। তিরস্কার আর গঞ্জনাই ছিল আমার পুরস্কার। আমি ছাড়া সংসারের কোন কাজই হোতো না। তবু আমি বুঝতে পারতাম না, কেন আমায় বলা হোতো সংসারের কাঁটা। আমার দুঃখে সমবেদনা জানাবার কোন লোক ছিল না। হঠাৎ একটি ছেলে একদিন পুকুরঘাটে আমায় জানালো যে আমার দুঃখে সে দুঃখী। সে আমায় সুখী কোরতে চায়। পৃথিবী আমার কাছে সুন্দর বোধ হোলো। এমন লোকও জগতে আছে।

তারপর একদিন রাত্রে দুজনে দুজনার সংসার ছেড়ে পথে বার হই। এক বছর আমরা দুজনে সুখে দুঃখে ঘর কোরেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ সে একদিন বাড়ী ফিরলো না। দিনের পর দিন গেল সে আর ফিরলো না। সে বেঁচে আছে কি মারা গেছে, তাও আমি জানি না। তবে আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই সে বেঁচে আছে। আজও আমি বুঝতে পারি না কেন সে চলে গেল। বিশ্বাস করুন, তারকবাবু, সে সত্যই আমাকে ভালবাসতো।

আপনার কোন কথাই আমি অবিশ্বাস কোরছিনা।

আমার সৌভাগ্য। নন্দিনী বোলতে থাকে—সে চলে যাবার পর সেকি ভীষণ দারিদ্র্যের হাতে লাঞ্ছনা। কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ—এই নিয়ে লাগলো মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এমন সময় আলাপ হোলো একটি মেয়ের সঙ্গে। লোকে হয়ত বোলবে সে আমার খারাপ সাথী, কিন্তু সেই আমার দুর্দিনের বন্ধু। সেই আমায় খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার সোজা পথ দেখালে। আজ আমি একজন সত্যিই বারবণিতা। সতীত্বের কথা শুনলে আজ আমার হাসি পায়। ফ্রিম লাইনেও ছদ্মবেশে একই ব্যাপার। প্রোডুইসারের কিংবা ডিরেক্টরের

মন জোগাতে না পারলে পাওয়া যায় না কোন ভূমিকা—তাত আপনি জানেন।

হাঁ, এই কয়দিনেই এ পরিচয় আমি পেয়েছি। তবে বুঝে দেখুন আমাদের অবস্থা। এই ক্লেদপূর্ণ জীবন থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। আমি সংসারের লোভে—সুখের আশায় ঘর ছেড়েছিলাম। কিন্তু আমি তাত পেলাম না…আমি ঘর-সংসার, পুত্র-কন্যা চাই। দশজনের মধ্যে আমিও চাই অভাব-অনটনের ভেতরে ছোট একটি নীড়। সে যে কত সুখের তা আপনাকে কি কোরে বোঝাবো।

তারক ধীরস্বরে বলে—তোমার মনের ব্যথা আমি বুঝি, কিন্তু সমবেদনা ছাড়া তোমাকে আমার আর ত কিছুই দেবার নেই।

নন্দিনী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—আপনার সমবেদনাই আমার দুঃখের জীবনে রইলো একমাত্র সম্বল। আবার আসবেন।

নন্দিনী ভূমিষ্ঠ হয়ে তারককে প্রণাম করে।

নন্দিনীর কাছে বিদায় নিয়ে তারক চলেছিল বাড়ীর পথে। রাত একটু হয়েছে। সারা পাড়াটা যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। কি অদ্ভুত জঘন্যই না এদের জীবন ধারা। মানুষের আদিম নগ্ন রূপ প্রকাশ পায় এই সব স্থানে। আচমকা একটি লোকের সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা লেগে যায় তারকের।

দেখে চলতে পারেন না?

আরে তারক নাকি?

হাঁ, তুই এখানে সুশীল? যাক, ভালই হোলো তোর সঙ্গে দেখা হয়ে—

সুশীল তাড়াতাড়ি বলে—এই কাগজগুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যা। ভীষণ দরকারি কাগজ। পুলিশ আমাকে ফলো করেছে।

সুশীল তারকের হাতে কতকগুলো কাগজ দিয়ে দ্রুতবেগে চলে যায়। তারকও সামনের দিকে জোরে পা চালিয়ে দেয়।

কেউ অনুসরণ কোরছে না ত? তারক পিছু ফিরে তাকায়। সামরিক পোষাক পরা একটি লোক তার পিছু পিছু আসছে। তারককে সন্দেহ কোরেছে নাকি? তারক পায়ের গতি দ্রুততর কোরে দেয়। এ রাস্তা ও রাস্তা অনেক ঘোরাঘুরি করে। নাঃ! লোকটা ঠিক তার পেছু নিয়েছে। পাশের অন্ধকারময় একটা সরু গলিতে তারক চকিতে ঢুকে পড়ে। আবছা অন্ধকারে প্রতি বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিম্ন শ্রেণীর গণিকারা। একটা বাড়ীর মধ্যে তারক সোজা ঢুকে পড়ে।

মেয়েটি পিছু পিছু ঘরের মধ্যে আসে। টিপটিপ কোরে দেয়ালে একটি আলো জ্বলছিল। তারক ফুঁ দিয়ে আলোটা নিবিয়ে দেয়।

একি আলোটা নিবিয়ে দিলেন?—মেয়েটি প্রশ্ন করে।

অন্ধকারই ভাল। তারক বলে—দরজাটা বন্ধ কোরে দাও।

তারক বিছানার ওপর সটান শুয়ে পড়ে।

তোমায় কত দিতে হবে?—তারক জিজ্ঞাসা করে।

দয়া কোরে যা দেবেন তাই নেবো।

এই নাও—ছুটো টাকার বেশি আর আমার কাছে নেই।

হাতপেতে মেয়েটি টাকা ছুটো নেয়। বাইরের দরজায় আঘাতের শব্দ শোনা যায়। মেয়েটি বলে—একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি। সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তারক শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে। সেই লোকটা এল নাকি?

মেয়েটি ফিরে এসে বলে—আপনি আচ্ছা লোক ত!

কেন, কি হোয়েছে?

হবে আর কি, পুলিশ আপনার খোঁজ কোরছিল। অনেক মিথ্যা কথা বোলে তবে তাকে ভাগিয়েছি। এই নিন আপনার টাকা পুলিশ হয়ত আবার আসবে। শেষে কি আমি বিপদে পড়বো।

চলে আমি যাচ্ছি। তবে টাকা ফেরৎ আমি চাই না।

না, আপনার টাকা আমি চাই না। কোথায় চুরি না ডাকাতি কোরে এনেছেন তার ঠিক নেই।

বেশ। তারক টাকা ছুটো পকেটে রাখে। কোন খারাপ কাজ কোরে আমি আসিনি। যাই হোক, তুমি আমায় এই সময়টুকুর জন্য আশ্রয় দিয়ে অনেক উপকার কোরেছ।

আমায় ক্ষমা কোরবেন। বুঝেছি, আপনি স্বদেশীর লোক। কিন্তু এখানে আর বেশিক্ষণ থাকলে হয়ত আবার পুলিশ আসবে।

দোষ তোমাদের কিছু নেই। আমি জানি, তোমাদের অচেনা লোককে আশ্রয় দিয়ে অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়। আচ্ছা, আমি চলি।

দাঁড়ান। সামনের দরজা দিয়ে যাবেন না। পুলিশটা হয়ত লক্ষ্য কোরছে। একটু অপেক্ষা করুন। আলোটা জ্বেলে আপনাকে পেছনের দরজা দিয়ে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দেবো।

মেয়েটি আলো জ্বালতেই মুখে তার আলো পড়ে। তারক চমকে উঠে বলে—মায়া!

অত্যধিক চমকে মায়া বলে তারকবাবু! বিস্ময়ে তার মাথার কাপড় পড়ে যায়। পায়ের তলা থেকে যেন মেঝেটা সরে যায়।

তারক মৃদুস্বরে বলে—কার ওপর তুমি প্রতিশোধ নিলে, মায়া?

ভগবানের ওপর।

তাতে ত ভগবানের কোন ক্ষতি হোল না। ক্ষতি হোলো তোমারই।

ভগবানেরই ক্ষতি হয়েছে। মিথ্যা দয়ার সাগর সেজে যে সিংহাসনে সে বসেছিল। সেই সিংহাসন থেকে তাকে আমি ধুলোয় ফেলে দিয়েছি।

তুমি বুঝি আজ ভগবানও মানো না?

না। যে দেশের লোক মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না পয়সার অভাবে, নারীর সতীত্ব রক্ষা কোরতে পারে না বলের অভাবে, দুর্ভিক্ষে,

বন্যায়, মড়কে, অনাহারে হাজার হাজার লোক যে দেশে মরে যায় সে দেশে ভগবান্ নেই।

ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক কোরতে চাই না। তবে আজ এইটুকু শুধু বোলবো যে, সেদিন তুমি আমায় ফিরিয়ে দিয়ে ভুল কোরেছিলে।

কোন্ অধিকারে আমি আপনার কাছে যেতাম?

আর কোনও অধিকার স্বীকার করো আর না করো। বোনের দাবী নিয়েও ত তুমি যেতে পারতে আমার কাছে।

বোনের দাবী নিয়ে!

হাঁ, বোন। আজও সে দাবী নিয়ে তুমি আসতে পারো।

আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলাম দাদা। আমায় তুমি মার্জনা করো। চল, দাদা, তোমায় এগিয়ে দিই।

আজও তুমি আমায় ফিরিয়ে দেবে? তারক অনুযোগ করে।

এ আমার ভুলের সংশোধন, দাদা। আমায় অনুরোধ করো না। ভবিষ্যতে আর কখনও এখানে এস না।

ভূমিষ্ঠ হয়ে মায়া তারককে প্রণাম করে। নৈশ অন্ধকারে তারক অদৃশ্য হয়ে যায়। মায়ার চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্ কোরে অশ্রুধারা ঝোরে পড়ে।

শিবশংকর বারান্দায় বসে চা পান কোরছিল। একটা মোটর এসে দাঁড়ায়—সুমিত্রা মোটর থেকে নামে।

সুমিত্রা দেবী, দার্জিলিং থেকে কবে ফিরলেন?

আজই সকালে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সুমিত্রা বলে।

বসুন।

না, বোসবো না। আমার চিঠির উত্তর দেন নি কেন, তাই আগে বলুন।

লজ্জিত হয়ে শিবশংকর বলে—চিঠি লিখেছিলাম, তারপর পোষ্ট কোরতে ভুল হয়ে গেছে।

বন্ধুর হাওয়া গায়ে লাগলো নাকি?

হাস্য মুখে শিবশংকর বলে—না, অত সৌভাগ্য আমার হয়নি। তার কাছে কাছে থাকলে তবে ত আমার গায়ে তার হাওয়া লাগবে।

তার মানে?

অতি সহজ অর্থ। তারকের দেখাই পাওয়া ভার। সে যে কোথায় থাকে, আর কি করে তা সেই জানে। আগে তবু অফিসে ওর সঙ্গে নিয়মিত দেখা হোতো। এখন আমরা দুজনেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, তাই......হুঁ।

এদিকে আবার বইয়ের স্যুটিং তোলাও শেষ হয়ে গেল—এখন বোধ হয় তারকের আর দেখাই পাওয়া যাবে না। থাক ওসব কথা। আপনি দার্জিলিং গেলেনই বা কেন, আর হঠাৎ ফিরে...

এলামই বা কেন? এ কথার জবাব হচ্ছে, কিছুদিন আগে মনটা বড় চঞ্চল হয়েছিল, কিছুই ভাল লাগছিল না। তাই মনটা স্থির করবার জন্য সুযোগ পেতেই চলে গেলাম।

আশা করি, এখন মন স্থির হয়েছে,

হাঁ।

আর আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? বসুন। শিবশংকর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বসতে ভাল লাগছে না। বাইরে একটু হাওয়া খেতে গেলে কেমন হয়?

আপত্তি নেই, চলুন।

দুজনে মোটরে এসে বসে। সুমিত্রা ড্রাইভ কোরতে থাকে। সে শিবশংকরকে জিজ্ঞাসা করে—লোকালয় ছেড়ে পল্লীর বুকে একটু যাওয়া যাক, কি বলুন?

আপনার সব কথাতেই আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।

ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে সুমিত্রা বলে—সত্যই!

মুচকি হেসে শিবশংকর সায় দেয়।

হু হু কোরে মোটর লোকালয় ছেড়ে নির্জন পথের উপর দিয়ে এগিয়ে চলে। পথের দুধারের বিশাল বটগাছগুলো সাঁ সাঁ কোরে উল্টোদিকে ছুটে যায়। প্রশান্ত রাজপথ ভারতের বুক চিরে চলে গেছে একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। পাঠান বীর শেরসাহের আমলে সর্বপ্রথম লোকচলাচলের জন্য নির্মাণ হয়েছিল ঐ সুদূর বিস্তারিত পথ। সুমিত্রা ভাবতে ভাবতে চলেছিল সেকালে আর একালের ব্যবধান।

মোটর বড়রাস্তা ছেড়ে একটা কাঁচা রাস্তা ধরে। সহসা মোটরটা থেমে যায়।

হঠাৎ মোটর থামালেন যে? শিবশংকর জিজ্ঞাসা করে।

আমি থামাই নি—আপনি থেমে গেছে।

সেকি! তেল ফুরলো নাকি?

দেখছি, বলে সুমিত্রা মোটর থেকে নেমে পেট্রোল টিন পরীক্ষা কোরে দেখে হতাশ হয়ে যায়।

আপনার অনুমানই ঠিক। সুমিত্রা বলে।

তা হোলে উপায়?

কিছু দেখছিনাত। মাঠের কাজ শেষ কোরে লোকজনও ত সব চলে গেছে ঘরে। সন্ধ্যা হোতে আর দেরি নেই।

শিবশংকর বলে—আসুন, এখন দুজনে মিলে ঠেলে রাস্তার একপাশে মোটরটা রাখা যাক।

মোটরটা এক পাশে রেখে দুজনে চুপচাপ পাদানির ওপর বসে থাকে।

শিববাবু!

বলুন।

আমার কাছে পেট্রোলের কুপোন আছে।

কুপোনে গাড়ী চলবে না।

তা বটে। আচ্ছা, একটা লোকও ত যাচ্ছে না।

পাণ্ডববর্জিত দেশ। শিবশংকর হঠাৎ আশান্বিত হয়ে বলে—দূরে ঘোড়ায় চড়ে একজন লোক আসছে বলে মনে হোচ্ছে।

একটু পরেই একজন অশ্বারোহী ভদ্রলোক এসে পড়েন। শিবশংকর হাত নেড়ে থামতে ইসারা করে। অবাক্ হয়ে ভদ্রলোক ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন।

শিবশংকর আমতা আমতা কোরে বলে—কিছু মনে কোরবেন না। হঠাৎ একটু বিপদে পড়ে গেছি। যদি একটু সাহায্য করেন।

নিশ্চয়ই। বলুন আমি কি কোরতে পারি।

শিবশংকর বলে—কোলকাতা থেকে বেরিয়েছিলাম একটু হাওয়া খাবো বলে, কিন্তু পথের মাঝে মোটরের পেট্রোল ফুরিয়ে যেতে এই অভাবনীয় বিপদ।

তা পেট্রোল আমি জোগাড় কোরতে পারি। তবে কুপোন থাকলে সুবিধা হোতো।

কুপোন আমাদের কাছে আছে—সুমিত্রা বলে ওঠে।

ভদ্রলোক বলেন—তবে ত ভালই, দিন, কুপোন দিন আর টাকা দিন। পেট্রোল আমি এনে দিচ্ছি।

শিবশংকর বলে—আপনি যাবেন কেন? কোন্ দিকে বলে দিন আমিই নিয়ে আসছি।

সে অনেক দূর আপনি যেতে পারবেন না। আমি ঘোড়ায় চোড়ে যাবো আর আসবো।—তাছাড়া আপনার আপত্তির কারণ কি? টাকা নিয়ে পালাবো—এই ভয় হোচ্ছে নাকি?

না—না! কি যে বলেন!—শিবশংকর ও সুমিত্রা একসঙ্গে বলে ওঠে। হেসে সুমিত্রা বলে—আপনার পোষাক-পরিচ্ছদেই বোঝা যাচ্ছে আপনি একজন দেশসেবক।

কি রকম?—ভদ্রলোক হেসে জিজ্ঞাসা করেন।

এই খদ্দরের জামা কাপড়, গায়ে জহর কোট—মাথায় গান্ধী টুপি।

সুতরাং আর আমায় অবিশ্বাস করা যায় না। আপনারা সহরের লোক—জামাকাপড়টাই আগে দেখেন।

সুমিত্রা বলে—আপনাকে আমরা অবিশ্বাস করি নি। সুতরাং ও কথা আসেই না। আর সহরের নামে আমাদের যে বিদ্রূপ কোরলেন তার জবাব আমি দেবো না। কারণ আপনি এখন আমাদের একমাত্র ভরসা।

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বলেন—আপনি দেখছি রীতিমত রেগে গেছেন। আমার কথা আমি প্রত্যাখ্যান কোরছি। আর অপরাধ স্বীকার কোরছি।

শিবশংকর বলে—ছেড়ে দিন ওসব বাজে কথা। আপনার বাড়ী কি কাছেই?

হ্যাঁ। এই একটা গ্রাম পার।

তা এধারে কোথায় গেছলেন?

এই কিছু দূরে একটা কৃষাণ-সম্মেলন ছিল।

সুমিত্রা বলে—বুঝেছি, আপনি একজন দেশনেতা।

না, আমি দেশমাতৃকার একজন দীনসেবক।

আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?

স্বচ্ছন্দে।—আমার নাম শান্তিদেব বসু। এই কাছেই রূপনগর গ্রামে বাড়ী।

শিবশংকর বলে—এবার আমাদের পরিচয়টা নিন। ইনি হোচ্ছেন ফ্লিম ডিরেক্টার শ্রীমহীতোষ রায়ের কন্যা সুমিত্রা দেবী।

ও। শান্তিদেব বলে—যিনি তারকবাবুর একটি বইয়ের ছবি তুলছেন?

হ্যাঁ। সুমিত্রা বলে—আপনি বাবাকে চেনেন নাকি?

না। ফ্লিম লাইনে আমি কাউকেই চিনি না। তবে আমাদের তারকবাবুর বই তুলছেন বোলেই ওঁর নাম শুনেছি।

তারকবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে বুঝি?

হাঁ, তাঁর পৈতৃক বাড়ী আমাদেরই গ্রামে।

শিবশংকর বলে—আপনি তাহোলে আমাদের আত্মীয়।

আপনার পরিচয় ত পেলাম না।—শান্তিদেব বলে।

সুমিত্রা উত্তর দেয়—ইনি তারকবাবুর একজন বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁর বইয়ের নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

আপনি তাহোলে একজন অভিনেতা।

একেবারেই না। তারকের জন্যই এই প্রথম আমি ফ্লিমে অভিনয় কোরছি।

তারকদার খবর কিছু জানেন? শান্তিদেব জিজ্ঞাসা করে।

শিবশংকর বলে—তারকের সঙ্গে যখন আপনার পরিচয় আছে, তখন নিশ্চয়ই তার প্রকৃতি জানেন।

তা ঠিক। তবে তিনি ভাল আছেন ত?

হাঁ।

সুমিত্রা বলে—আচ্ছা, শান্তিদেববাবু, তারকবাবুর বাড়ীতে কে আছেন?

কাকাবাবু, তাঁর মেয়ে আর তারকদার স্ত্রী।

স্ত্রী!—শিবশংকর আর সুমিত্রা চমকে ওঠে।

আপনারা জানেন না বুঝি। তারকদাকে হঠাৎ বিয়ে কোরতে হয়েছে।

না। সুমিত্রা বলে।

এই কিছুদিন আগে, যখন তারকদা তাঁর কাকাবাবুর অসুখের সময় এসেছিলেন, তখনই বিয়ে হয়। ব্যাপারটা হোলো কি জানেন—আমাদের পাড়ার একটি মেয়ের বিয়ে ছিল। এদিকে লগ্নের সময় চলে যায় বর আসে না। পরে জানা গেল বর অন্য জায়গায় বিয়ে কোরতে গেছে বেশি টাকার লোভে। তখন সবাই মিলে জোর কোরে তারকদার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দিলাম।

আশ্চর্য! সুমিত্রার মুখ দিয়ে বার হয়।

পৃথিবীতে সবই আশ্চর্য—শান্তিদেব বলে।—এই দেখুন না, হঠাৎ আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল কি রকম। আরে অন্ধকার হয়ে এল যে। দিন কুপোন আর টাকা।

শান্তিদেব ঘোড়ায় চড়ে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অন্ধকার ক্রমশঃ ঘন হয়ে ওঠে। শিবশংকর ধীরে ধীরে বলে—আপনি মনে ব্যথা পেয়েছেন, সুমিত্রা দেবী।

না, শিববাব, আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। আমি জানতাম যে তারকবাবুকে পাবার আশা দুরাশা। তাই তাঁকে আমি কোন দিনই আশা কোরিনি। তাঁকে আমি আজও ভালবাসি, যেমন ভালবাসি আকাশের চাঁদকে। চাঁদকে পাবার আশায় ভালবাসি না—পাবো না বোলেই ভালবাসি। শিববাবু, যাকে আমি সত্যই পেতে চাই, সে কিন্তু কিছুতেই বোঝে না।

তা হবে। আমার ভুল ধারণা ছিল।

আজ কি ধারণা হোলো ?

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

কোন দিন কি বোঝবার চেষ্টা কোরেছেন ? আমিও ঐ রকম বুঝতে পারতাম না। তাই এবার দার্জিলিং গিয়ে ভাল কোরে নিজের মনকে বুঝে এসেছি।

শিবশংকর মৃদুস্বরে বলে—কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে যে তারকের ওপর আপনার অভিমান হয়েছে।

পাষাণের ওপর অভিমান কোরে লাভ! অভিমান আমার অন্য লোকের ওপর।—যে আমার এত দিন এত কাছে থেকে আমায় চিনে নিতে পারলো না।

দুজনের মধ্যে গভীর নীরবতা নেমে আসে। শীতের রাত্রি। গায়ে গরম কোট চাপিয়ে দুজনে নীরবে বসে থাকে। হঠাৎ গাছের পাতার ফাঁক থেকে একরাশ চাঁদের আলো এসে মোটরের ওপর পড়ে।

চাঁদ উঠেছে।—সুমিত্রা বলে।

হাঁ। গম্ভীর স্বরে শিবশংকর উত্তর দেয়।

একটু পরে শান্তিদেব এসে পড়ে। শীতের রাত্রেও সে বেশ ঘেমে উঠেছে।

শিবশংকর মোটরে তেল ঢেলে বলে—এখান থেকে কতখানি দূর ?

এই মাইল দুই হবে। একটা রেল স্টেশনের কাছে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ওপরেই।—শান্তিদেব বলে।

সুমিত্রা বলে—আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। শুষ্ক ধন্যবাদ আর দেবো না।

শান্তিদেব হেসে বলে—কষ্ট আর কি। আপনাদের একটু উপকার কোরতে পারলাম, এই আমার কাছে যথেষ্ট। একটা অনুরোধ কোরবো ?

এ কথা আবার জিজ্ঞাসা কোরতে হয়।

আজকের রাতটা গরীবের বাড়ীতে চলুন না।

সুমিত্রা বলে—যেতাম, তবে বাড়ীতে কিছু বলে আসিনি। তাঁরা অত্যন্ত ভাববেন। তবে পরে একদিন নিশ্চয়ই আসবো।

তা হোলে আর দেরি কোরে লাভ কি ? মোটরে উঠুন।

তারা দুজনে মোটরে উঠে বসে। সুমিত্রা মোটরের মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

তা হোলে আসি, শান্তিদেববাবু।

হাঁ, আসুন। শান্তিদেব বলে—জয় হিন্দ !

ওরা দুজনে বলে—জয় হিন্দ !

মোটর চলে যায়। শান্তিদেব ঘোড়ায় চড়ে গাঁয়ের পথ ধরে।

তারকদা।

কে বিষ্টু ? আয় ওপরে আয়।

বিষ্টু ঘরে ঢুকতেই তারকের বুকটা ধড়াস কোরে ওঠে।

ম্লান ভাবে তারক জিজ্ঞাসা করে—কি খবর, বিষ্টু ?

খবর আর কি! তোমার লেখা বই কয়েকদিন হোলো মুক্তি পেয়েছে। সহরের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য এনেছে। কিন্তু তোমায় দেখে মনে হয়, তুমি যেন একটু মুসড়ে রয়েছো।

দেখেছিস তুই ?

তোমার লেখা বই টিকিট কেটে দেখতে হবে নাকি ? বক্সে বসে পাসে দেখবো।

তাই নাকি।

হাঁ, আচ্ছা তারকদা, একটা জিনিস লক্ষ্য কোরলাম, লোকে তোমার বইয়ের ডিরেক্টারকে আর অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রশংসা কোরছে, লেখকের ত বড় একটা প্রশংসা কোরছে না।

ওইটাই স্বাভাবিক। লেখক থাকে চিরকালই অন্তরালে।

এটা কিন্তু অন্যায়। বিষ্টু বলে—ঐ ডিরেক্টার আগেও ত অনেক বই তুলেছেন কিন্তু এবার কি রকম নাম হয়েছে। তোমার বই না তুললে ওঁর অত নাম হোতো না।

তুই আমার দিক্‌টা টানছিস। জানিস না ত ডিরেক্টারদের কত পরিশ্রম কোরতে হয়।

তা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ভাল বই না হোলে ছবি সফল হয় না।

তারক বলে—তবে খারাপ বইও ভাল ডিরেক্টরের হাতে পড়লে সুন্দর হয়।

সে হাজারে বোধ হয় একটা।

তুই দেখছি, একটা মহাপাগল।

রামু ঘরে ঢুকে বলে—ছোটবাবু, কজন বাবু তোমায় ডাকছে।

জানা লোক ?

হাঁ, এই পাড়ার ছেলে। তবে তুমি বোধহয় ওদের কাউকেই চেন না।

দে ওপরে পাঠিয়ে।

রামু নীচে নেমে যায়। একটু পরেই কলরব কোরতে কোরতে প্রবেশ করে পাঁচ ছটি তরুণ যুবক।

নমস্কার।

তারক প্রতি নমস্কার জানিয়ে বসতে বলে।

তরুণদের মধ্যে একজন বলে—আমরা এই পাড়ারই ছেলে, তারকবাবু। আপনার সঙ্গে আলাপ কোরতে এলাম। আপনি ত এখানে কারো সঙ্গে মেশেন না। তাই আপনার পরিচয়ও আমরা ঠিক জানতাম না। আজ আমরা শুনলাম যে আমাদের পাড়ায় তারকবাবু নামে যে ভদ্রলোক বাস করেন তিনি খ্যাতনামা সাহিত্যিক…

থামুন, থামুন।—তারক হেসে বলে—আমি একেবারেই খ্যাতনামা সাহিত্যিক নই।

ভদ্রলোক বিনয়ের হাসি হেসে বলে—যে আপনার বই দেখেছে, সেই আপনার পরিচয় পেয়েছে, দেখুন আমাদের একটি অনুরোধ আছে।

বলুন।

আমাদের এখানে একটি প্রগতি সংঘ আছে। আমি এই সংঘের সম্পাদক। আমার নাম বিমলেন্দু ঘটক। আর এরা হচ্ছে সব সংঘের একনিষ্ঠ সভ্য। আমরা কাল রবিবারে একটি সভার আয়োজন করেছি। আমাদের সংঘের তরফ থেকে আপনাকে সংবর্ধনা জানানো হবে। আপনাকে যেতে হবে।

তারক বলে—মাপ করবেন। ওটা আমার দ্বারা হবে না। আপনারা মিছিমিছি আমাকে বড় কোরছেন।

তা হবে না আপনাকে যেতেই হবে।

সকলে অনুরোধ কোরে ওঠে।

দেখুন। তারক বলে—এটা পাগলামো ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি এমন কিছু বড় হইনি যার জন্য আমাকে সাধারণভাবে সংবর্ধনা জানাতে হবে।

না, তারকবাবু, আপনাকে যেতেই হবে। ছোট ভাইদের এই আব্দারটুকু রাখুন।

আমায় ক্ষমা কোরবেন, বিমলেন্দুবাবু।

বিষ্টু এতক্ষণে কথা বলে—এটা তোমার অন্যায় তারকদা। এঁরা এত কোরে অনুরোধ কোরছেন, আর তুমি এদের নিরাশ কোরছ।

বলুন ভাই, আপনি।—বিমলেন্দু বলে ওঠে—আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন আপনার তারকদাকে। আমরা হয়ত ওঁর প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান জানাতে পারবো না, তবে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা কোরবো।

তারক বলে—আপনারা এই কয়েকজন আমায় ভালবেসে যে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তাই আমার কাছে যথেষ্ট। এই আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার।

বিষ্টু বলে—ও সব বললে হবে না। তোমাকে যেতেই হবে। আচ্ছা, বিমলেন্দুবাবু, রবিবার কখন যেতে হবে?

বিকাল পাঁচটায়। তাহলে আপনি আসছেন ত তারকবাবু?

না গিয়ে কি বিষ্টুর হাত থেকে রেহাই আছে।—তরুণগণ উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

বিমলেন্দু বিষ্টুকে বলে—আপনার পরিচয় আমরা জানি না, কিন্তু আপনাকেও কাল যেতে হবে।

নিশ্চয়ই। আমি ত যাবই। আমার পরিচয় সামান্য। নাম বিষ্ণুপদ দত্ত। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ি। তারকদা আমাকে ভালবাসেন।

নমস্কার বিনিময় করে তরুণেরা চলে যায়।

বিষ্টু বলে—ভাল কথা মনে পড়েছে, তারকদা। মা একবার তোমাকে যেতে বলেছেন।

আমাকে?

হাঁ, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে। হঠাৎ তোমার মুখখানা শুকিয়ে গেল কেন?

বিষ্টু, তোমাদের কাছে আমি বিশ্বাসঘাতকতা কোরেছি। তারক শুষ্ককণ্ঠে বলে।

কি যে বলো, তারকদা, তার ঠিক নেই।

হাঁ, ভাই। তারক ধীরভাবে বলে—আমি অন্য জায়গায় বিয়ে কোরে ফেলেছি।

বি য়ে কো রে ফেলেছো!

হাঁ। তারক ভগ্নকণ্ঠে বলে—আমায় ক্ষমা করিস, ভাই।

ক্ষমা করবার আমি কে?—বিষ্টু হেসে বলে।—তুমি ত আর আমার কাছে কথা দাওনি। তা ছাড়া, এইটাই স্বাভাবিক, আজ তোমার নাম হয়েছে—সম্মান হোয়েছে। এখন কি আর আমাদের মত গরীবের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানো যায়।

বিষ্টু!

তুমি তোমার উপযুক্ত কাজই কোরেছ তারকদা। সমাজে তোমার প্রতিষ্ঠা চাই বৈকি। আমার কি মনে হচ্ছে জানো?—সত্যই কি এ যুগে ন্যায়, সত্য বলে কিছু নেই—বিশ্বাস বোলে কি অভিধানে কোন শব্দ নেই। আশ্চর্য!

আমার ওপর তুই অবিচার কোরছিস।

ঠিকই ত! তুমি ত আমাদের ওপর কোন অবিচার করোনি—অবিচার যা কোরেছি আমরাই। তাছাড়া তোমার মত নামজাদা সাহিত্যিকের ওপর অবিচার কোরলে লোকেই বা সহ্য কোরবে কেন?

বিষ্টু, আমার একটা কথা শোন···

কোন প্রয়োজন নেই, কেন-না এটা ত সত্য যে, তুমি আমার দিদিকে বিয়ে কোরতে পারবে না। আচ্ছা, চলি, নমস্কার।

বিষ্টু ঝড়ের মত ঘর থেকে চলে যায়। প্রকৃতির এ কি নির্মম পরিহাস! সত্যাশ্রয়ী তারক আজ মিথ্যাবাদী—প্রতারক—[illegible]!

বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে। শান্তিদেব গলা ছেড়ে গান ধরে। গাঁয়ে ঢুকে বাড়ী যাবার পথে তারকদের বাড়ী আগে পড়ে। শান্তিদেব ঘোড়া থেকে নেমে জমিদার বাড়ীর ভেতর ঢোকে। রমা দরজা খুলে দেয়, বলে—এত দেরি হোলো যে?

কেন, তোমার ভয় হোচ্ছিল বুঝি?

একটু হোচ্ছিলো। প্রায়ই ত শুনি অমুক সভায় অমুক দলের গুণ্ডার গুণ্ডামী।

তাতে ভয়ের কি আছে? তুমি জানো আমি রোজ ব্যায়াম করি। আমার গায়ে যথেষ্ট শক্তি আছে।

তা হোলে হবে কি!—এদিকে যে গান্ধীজীর চেলা হয়ে বসে আছ।

শান্তিদেব হেসে বলে—এতক্ষণে বুঝলাম তোমার ভয়ের কারণ। কিন্তু তুমি ত জানো বন্ধু, এ জেলায় হিন্দু মুসলমান সকলেই আমাকে ভালবাসে।

তা আমি জানি। কিন্তু গণ্ডগোল ত আর গাঁয়ের লোকেরা করে না—করে ভাড়াটে গুণ্ডার দল।

যেতে দাও ওসব কথা। কাকাবাবু কোথায়?

শরীর ভাল নয়, তাই কিছু আগেই শুয়ে পড়েছেন।

বৌঠান কি কোরছে?

কি বুনছে।

চল বৌঠানের সঙ্গে দেখা কোরে আসি।

দুজনে অলিন্দ অতিক্রম করে।

বৌঠান!—হাসি মুখে শান্তিদেব প্রবেশ করে। মাথায় ঘোমটা ঈষৎ টেনে রেণু বলে—আসুন।

শান্তিদেব হঠাৎ গম্ভীরভাবে বলে—আচ্ছা, বৌঠান, আমি ত তোমাকে 'তুমি' বলি, আর তুমি আমায় 'আপনি' বলো কেন বলোতো? অথচ তুমি গাঁয়েরই মেয়ে—এমন কি একটু সম্পর্কও

আছে। আশপাশের সব গাঁয়েরই মেয়েরা আমার সামনে বেরয়—আমায় আপন ভেবে 'তুমি' বোলে কথা বলে। আশ্চর্য! তুমি বিয়ের আগে আমার সঙ্গে কোন দিন কথা ত বলোইনি—এমন কি হঠাৎ যদি কখনও পথে ঘাটে কোনখানে দেখা হয়েছে ত তুমি এমন-ভাবে মুখ নীচু কোরে চলে গেছ যে, মনে হোতো আমি যেন ভিন্ গাঁয়ের কোন বদমাইস লোক।

থামলেন কেন? আর কি বলবার আছে বলুন।—রেণু মুখ টিপে হেসে বলে।

ওই ত তোমাদের দোষ। গুরুতর ব্যাপার হেসে এমন ধারা কোরে দাও যেন কিছুই হয়নি। কি বলো, রমা?

কি বোলবো?

এই মেয়েদের দোষ-সম্বন্ধে।

আমিও মেয়ে, বুঝেছ।

ও! তাহোলে তোমারও বৌঠানের সঙ্গে এক মত।—আমাকে 'আপনি' বলাটা তুমি সমর্থন করো।

রমা বলে—একা বৌদির দোষে তুমি সকল মেয়েকে দোষী কোরছ কেন?

ও একই কথা।

ঐ ত তোমাদের পুরুষদের গাজোরী।

বুঝেছি। শান্তিদেব বলে—তুমি আমার সঙ্গে তর্ক কোরতে চাও। বেশ, তবে এস, ভাল কোরেই তর্ক করা যাক। শান্তিদেব জামার আস্তিন গুটায়।

রেণু হেসে বলে—দোহাই ঠাকুর পো—আর মারামারি কোরবেন না। ঐ জিনিসটিতে আমার বড় ভয়।

রমা বলে—তুমি বুঝি আমার জন্য ভয় পাচ্ছো, বৌদি? কিন্তু ওর সঙ্গে মারামারি করা ত খুব সোজা, কারণ ও ত আর কাউকে মারবে না। উনি হোচ্ছেন অহিংস…

থামো—শান্তিদেব রেগে বলে। আমার আদর্শ নিয়ে তামাসা কোরো না। অহিংসবাদ—সম্বন্ধে তোমরা কি বোঝো ?

রমা বলে—খুব বুঝি—বাংলা দেশের মেয়েদের মত অহিংসাবাদী আর নেই।

হুঃ! তোমাদের দৌড় জানা আছে! শান্তিদেব রেণুর দিকে তাকিয়ে বলে—ওটা কি বোনা হোচ্ছে ?

জামা।

কার ?

আপনার।

এ আবার কি কথা। সে বেচারী কি দোষ কোরলে ?

রেণু লজ্জিত মুখ নীচু করে।

না, না। ও জামা আমি নেবো না।—শান্তিদেব বলে।—ও জামা তারকদাকে দিতে হবে।

রমা বলে—দিতে হবে ত বুঝলাম। কিন্তু যাকে দেবে তার যে দেখা পাওয়া যায় না।

ও আমি ঠিক পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবো।

না, ঠাকুর পো! তা হয় না।—রেণু বলে। এটা আপনার জন্যই কোরছি, আপনাকেই নিতে হবে।

জুলুম নাকি ?

নিশ্চয়ই।

যদি আমি বিক্ষোভ প্রদর্শন করি—শান্তিদেব বলে।

রমা জিজ্ঞাসা করে—নিশ্চয়ই শান্তিপূর্ণ ভাবে ?

নিশ্চয়ই—শান্তিপূর্ণ অহিংস ভাবে।

তা হোলে আমরা গুলি চালাবো।

হুঃ, খুব কথা শিখেছ দেখছি। গম্ভীর হোতে গিয়ে শান্তিদেব হেসে ফেলে, হঠাৎ ঘড়ির দিকে লক্ষ্য পড়তেই শান্তিদেব চমকে ওঠে।—আরে রাত্রি হোয়েছে বেশ! মা আবার ভাবছেন।

বৌদি!

কি ভাই?

সত্যি বৌদি, তুমি বড় লাজুক। বিয়ের আগে আমার সঙ্গেই কথা কইতে না। একদিন তোমার সঙ্গে ভাব কোরতে গেলাম, তা তুমি ঘর থেকে বারই হোলে না—দোরে খিল দিয়ে রইলে। আমি বড়লোকের মেয়ে তাই না?

সত্যি, ঠাকুরঝি; বড়লোকদের আমার ভাল লাগে না।

দাদাও ঐ কথা বলে। দাদা বলে কি জানো—বড়লোক-গরীব লোক আর থাকবে না।

তাই নাকি! আনন্দে রেণুর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

দাদার কথা শুনে মুখে দেখছি তোমার হাসি ফুটলো!

তা নয়, ভাই। তোমার ঐ কথা শুনে সত্যিই আমার আনন্দ হোচ্ছে। কিন্তু তাকি হবে, ভাই?

দাদা ত তাই বিশ্বাস করে।—রমা দৃঢ় স্বরে বলে। ক্ষণকাল পরে পুনরায় বলে—আচ্ছা, বৌদি, গরীবের বড় কষ্ট, না?

গরীবের দুঃখ তুমি কি বুঝবে, ঠাকুরঝি!

তোমার মত না বুঝলেও কিছু কিছু বুঝি, বৌদি।

রেণু কিছু বলে না, নীরবে জামা বুনে চলে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির জন্য ভারতের সর্বত্র আরম্ভ হোলো প্রবল গণ আন্দোলন। সরকার বাহাদুর সে কথায় কর্ণপাত কোরলেন না। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান সেনানায়কদের দিল্লীর প্রসিদ্ধ লাল কেল্লার প্রহসন-স্বরূপ আরম্ভ হয়েছে এক অদ্ভুত বিচার ব্যবস্থা। কংগ্রেস দলের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত হয়েছে ভারতের নামজাদা এক কৌঁশুলি-সম্প্রদায়। নিপুণভাবে সরকার সাক্ষীদের সাজাবার চেষ্টা কোরছেন। তবুও হঠাৎ এক সাক্ষীর মুখ দিয়ে জেরায়

কৌশলে বেরিয়ে গেল যে, তাকে যা বলতে হবে তা শিখিয়ে মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল? কিন্তু হোলে হবে কি? শাসক যেখানে শোষক আর ক্ষমতাবলে সেই যখন দণ্ডধারী তখন উপায় কি?—দেশে আরম্ভ হোলো ব্যাপক মুক্তি আন্দোলন।

সেদিন ১৯৪৫ সালের ২২-এ নভেম্বর। কোলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ছাত্রদের ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির জন্য এক জনসভা। সভাভঙ্গ হোলে আজাদী ফৌজের প্রহসনপূর্ণ বিচারের প্রতিবাদকল্পে এবং তাদের মুক্তির দাবী নিয়ে বার হয় এক বিরাট্ শান্তিপূর্ণ মিছিল। ধর্মতলার কাছে পুলিস-বাহিনী এসে মিছিলের গতি রোধ করে। আর যেতে দেওয়া হবে না। সামনে ডালহাউসী স্কোয়ার, গভর্ণরের বাড়ী, নিষিদ্ধ এলাকা! ছাত্রদল সে কথা শোনে না। তারা ডালহাউসী স্কোয়ার অতিক্রম কোরবেই। যুদ্ধ থেমে গেছে এখন আবার নিষিদ্ধ এলাকা কি। পুলিস পথ ছাড়ে না। মিছিল পথের ওপরেই বসে পড়ে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়। মুখোমুখী বসে থাকে দুই দল। শেষে পুলিসের ঘটে ধৈর্যচ্যুতি। জনতার উপর লাঠি চার্জ করে। উত্তেজিত জনতা পুলিসের বেষ্টনী ভেদ কোরে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। ক্রুদ্ধ পুলিস নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর প্রথম চালায় লাঠি, তারপর গুলি। আহত হয় বীর ছাত্রেরা··· নিহত হয় দেশপ্রাণ শহীদেরা···

তবু জনতা পালায় না। উপরন্তু দল আরও বৃদ্ধি পায়। নেতারা এসে ছাত্রদের বোঝায় ঘরে ফিরে যাবার জন্য। কিন্তু বৃথা—দেশ-মাতৃকার আহ্বান যারা শুনেছে, তাদের কাছে 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য।'

ক্রমে প্রভাত হয়। সারা সহরে ছড়িয়ে পড়ে এই খবর। ছাত্রদের ওপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদের জন্য সহরে সকল যান-বাহন বন্ধ থাকে। সারা সহরে দেখা দেয় প্রবল বিক্ষোভ। স্থানে স্থানে জনতা সামরিক গাড়ীতে ও পুলিস ভ্যানে অগ্নি সংযোগ করে। পুলিশ চালায় লাঠি, ছোঁড়ে গুলি, ছাড়ে কাঁদুনে গ্যাস।

আশ্চর্য! জনতা ভয় পায় না। নানা প্রকার ধ্বনি কোরতে কোরতে চলে ডালহাউসী স্কোয়ারের দিকে। পুলিস যেতে দেয় না। গোলযোগের মধ্যে কেটে যায় কয়েক দিন। সহরতলীর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ। কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। কয়েক স্থানের ট্রেণ চলাচল বন্ধ হয়।

শান্তিদেব ঘোড়ায় চড়ে দেশের বর্তমান অবস্থার কথা ভাবতে ভাবতে চলেছিল। চাষীরা সব ক্ষেপে উঠেছে। তাদের সংযত করা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ নেতাদের কাছ হোতে কোন রকম আহ্বান পাওয়া যাচ্ছে না। উপায় কি? নেতাদেরই ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে কাজ কোরে যেতে হবে। দেশের বর্তমান হাওয়ার গতি কোন্ পথে তাঁরা কি আর বুঝতে পারছেন না?

চলার গতি দ্রুত কোরে দেয় শান্তিদেব। মাঠটা পার হোয়ে ছোট জলাটা অতিক্রম কোরলেই গাজিপুর পৌঁছানো যাবে। জঙ্গলের ভেতরটা বেশ অন্ধকার—সাবধানে পথ চলতে হয়। মাঝে মাঝে এই জঙ্গলের মধ্যে দুর্ঘটনা হয়।

খবরদার!

চকিতে শান্তিদেব ঘোড়ার রাশ শক্ত কোরে দাঁড়ায়।

কে বটিস্?—অন্ধকার থেকে প্রশ্ন আসে।

তোমরা কে?—শান্তিদেব জিজ্ঞাসা করে।

সেলাম, বাবু।

গোড় লাগে, বাবু।

অন্ধকার হোতে বার হয়ে আসে কতকগুলো সাঁওতাল ও গ্রাম্য চাষী।

আমরা আপনাকে দারোগা ভেবেছিলাম। গলার আওয়াজে চিনতে পারি। না হোলে হোয়েছিল আর কি বিপদ।

তোমরা এখানে কি কোরছ ?

কেউ উত্তর দেয় না—পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করে।

শের আলি কোথায় ?

বোধ হয় ঘরে আছে। এখুনি আসবে।

তোমরা সব বাড়ী যাও। শান্তিদেব বলে।

কিন্তু আলি ভাই…

আমি যাচ্ছি আলি ভাইয়ের কাছে। শান্তিদেব আদেশের ভঙ্গিতে বলে—যাও, বাড়ী যাও। কেন আমি তোমাদের যেতে বলেছি তা কাল সকালে তোমাদের বোলবো।

শান্তিদেবকে অভিবাদন কোরে লোকগুলো অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। শান্তিদেব শের আলির বাড়ীর দিকে ঘোড়া দ্রুতবেগে ছুটিয়ে দেয়।

দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ কোরতেই শের আলি চমকে ওঠে—শান্তি ভাই।

হাঁ, তোমার কাপড় পরা দেখে মনে হচ্ছে যে, কোথাও বেরোবে।

হাঁ। শের আলি বলে। কিন্তু তুমি এই এত রাতে? হেঁটে এলে, না ঘোড়ায়।

বাড়ীতে আর থাকতে দিলে কই। এসেছি ঘোড়ায়।—বোধহয় ঘোড়াটা দূরে রেখে এসেছ। যাই হোক, কি দরকার বলো। আমি একটু ব্যস্ত আছি।

যাদের জন্য ব্যস্ত হোচ্ছ তাদের বাড়ী যেতে বোলে এসেছি। শান্তিদেব স্থিরভাবে বলে।

তার মানে ?

অতি সহজ। তুমি আজ যে কাজ কোরতে যাচ্ছিলে তা অতি অন্যায়।

ন্যায় অন্যায় আমি বুঝি না।—শের আলি ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে বলে। এইটুকু শুধু বুঝি যে, আজ এসেছে জাতির আহ্বান।

না—কংগ্রেস থেকে এখনও আসেনি আহ্বান। সে ডাক আসতে এখনও কিছু দেরি আছে।

কংগ্রেস টংগ্রেস বুঝি না।

তুমি কি বোলছ, আলি ভাই!

ঠিকই বোলছি আমি। আজ জাতি মুক্তির জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। এ সময় তাকে শান্ত হোতে বলাটা পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়।

আমি স্বীকার করি, জাতি আজ মুক্তির জন্য পাগল। কিন্তু শৃঙ্খলানুবর্তী—নিয়মানুবর্তী না হোলে কোন কাজই সফল হয় না। এখানে ওখানে ছোট ছোট আন্দোলন কোরলে চলবে না। সারা ভারতবর্ষব্যাপী কোরতে হবে বিরাট্ গণ-আন্দোলন। আর তা কোরতে হোলে স্থির মস্তিষ্কে ভারতের যে সর্ববৃহৎ স্বাধীনতা আন্দোলনের দল কংগ্রেস—তার ওপর আস্থা রেখে নির্দিষ্ট কার্য্যসূচী অবলম্বন কোরে এগোতে হবে। তা না হোলে বুদ্‌বুদের মতই মিলিয়ে যাবে ছোটখাটো সংঘাত এই বিশাল ভারতসমুদ্রে। তাই কংগ্রেসের অহিংস মতবাদের ওপর…

বাধা দিয়ে শের আলি বলে—এবার তোমার কথার প্রতিবাদ করি। অহিংস মতবাদের ওপর আর আমার আস্থা নেই।

কিছুদিন আগেও ত ছিল।

তা ছিল। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা জানবার পর থেকে আমার মনের মধ্যে এলো পরিবর্তন।

কই, এতদিন ত আমাকে এ কথা জানাও নি।

জানাবার হয়ত প্রয়োজন হয়নি। তবে যে তোমার অহিংসার দ্বারা হিন্দুস্থান স্বাধীন হবে, একথা আজ আর আমি বিশ্বাস করি না।

আলি সাহেব! বাইরে থেকে শব্দ আসে।

ভেতরে এস—শের আলি বলে।

আমার একটু দেরী হয়ে গেল—বোলতে বোলতে প্রবেশ করে গঙ্গারাম মাঝি। শান্তিদেবকে দেখেই মাঝি চমকে ওঠে—একি ছোটবাবু।

হাঁ। শান্তিদেব বলে—দেরি হোলেও ক্ষতি নেই, গঙ্গারাম। আজ আর কোথাও যেতে হবে না।

শের আলি বলে—শান্তি ভাই, আমাদের বারণ কোরলো। বলে, এখনও সময় হয়নি।

গঙ্গারাম বলে—এখনও সময় হয়নি!

না। শের আলি বলে—তবে এ বিষয়ে আমি শান্তি ভাইয়ের সঙ্গে খানিকটা এক মত। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি এক মত হোতে পারছি না।

কি বিষয়ে? গঙ্গারাম বলে।

অহিংসবাদ নিয়ে।

সত্যি! ছোটবাবু। ঐ অহিংস মতটা আমিও ঠিক বুঝি না।

শান্তিদেব বলে—তোমরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছ বোলে বুঝতে পারছ না। আচ্ছা, হিংসার পথে ইংরেজের সঙ্গে লড়তে পারবে? তোমাদের কি আছে?—যদিও অনেকের মতে বৃটিশ বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণীর শক্তি—তবু সম্পূর্ণ নিরস্ত্র পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে ত যথেষ্ট।

কিন্তু আমরা দুর্বল নই। গঙ্গারাম বলে।

ওটা তোমার ভুল ধারণা। দুর্বলই আত্মরক্ষার জন্য হিংসার পথে অস্ত্র ব্যবহার করে। সবলের প্রধান অস্ত্র অহিংসা। কথাটা খুলে বলি। অস্ত্র নিয়ে অস্ত্রধারীর সম্মুখে এগনোর চাইতে নিরস্ত্র হয়ে অস্ত্রধারীর সামনে এগনোই যথার্থ সাহসের পরিচয়।

কিন্তু ছোটবাবু, যতক্ষণ হাতে একগ্যাছা লাঠি আছে, ততক্ষণ কাউকে ভয় করি না।

সেই কথাই আমি বোলতে চাই। শান্তিদেব বোলে যায়—তুমি দুর্বল। তাই তোমার অবস্থার অনুপাতে ভরসা শুধু একখানা লাঠির ওপর। তেমনি অবস্থার অনুপাতে কারু ভরসা বন্দুক, কারু কামান, কারু বোমা...এই রকম ক্রমশ মানুষ সৃষ্টি কোরেছে বিরাট ধ্বংসকারী অ্যাটম বোম! কিন্তু কই, আজও ত মানুষ ভয়শূন্য হোতে পারেনি। আজও মানুষ চেষ্টা কোরে চলেছে অ্যাটম বোমের চাইতে ধ্বংসকারী কিছু আবিষ্কার কোরতে। তাই এই ধ্বংসের হাত থেকে পৃথিবীতে শান্তি আনতে পারে একমাত্র অহিংস নীতি।

গঙ্গারাম বলে—তাই কি হবে, ছোটবাবু? তাছাড়া আমরা ত বৌদ্ধ নই—আমরা হিন্দু।

শের আলি বলে—আর আমরা ইসলামধর্মী—বীরের জাত্।

হিন্দুধর্ম বা ইসলামধর্ম কি কারু ওপর হিংসাভাব পোষণ কোরতে বোলেছে?

তর্ক থাক, শান্তিভাই। অনেক রাত হোলো—তুমি এখন বাড়ী যাও।

শান্তিদেব বলে—বুঝেছি আলি ভাই, তুমি আমায় বিদায় দিতে চাও।

আমায় ভুল বুঝোনা, বন্ধু।—শের আলি বলে।—হয়ত আজ আমাদের মতের কিছু পার্থক্য হয়েছে—কিন্তু আমাদের লক্ষ্য এক।

শান্তিদেব বলে—ঠিক। এ কথাটা আমাদের—সব সময় মনে রাখতে হবে। বল তাহোলে। জয়হিন্দ!

জয়হিন্দ!—শের আলি ও গঙ্গারাম উভয়ে একসঙ্গে বলে।

শান্তিদেব ধীরপদক্ষেপে চলে যায়।

দরজা খুলে বন্দনা তারককে চিনতে পারে না। মাথায় কাপড় ঈষৎ টেনে দেয়। হাস্যমুখে তারক বলে—

আমায় চিনতে পারছ না, বোদি।

ও! ঠাকুরপো। বন্দনা একমুখ হেসে বলে—এস, ভাই, ভেতরে

এস। সেই একদিন রাতে এসেছিলে এ বাড়ীতে। আর কতক্ষণই বা ছিলে। কি কোরে চিনি বলো।

যাক, এবারে ত চিনতে পেরেছ।

তা পেরেছি।

বসতে একটা টুল দিয়ে বন্দনা জিজ্ঞাসা করে—বন্ধুর খোঁজে এসেছ কি?

হ্যাঁ।

কিন্তু দিন পনেরো তার দেখা নেই।

তা হবে। তবে আজ এই সময় এইখানে তার সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে। আচ্ছা, বৌদি, সুশীল ত বাইরে বাইরেই থাকে। একা তোমার থাকতে কষ্ট হয় না?

না—কষ্ট আর কি। আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

সারাদিন একলা কি করো?

কত কাজ করি—এই জামা সেলাই কোরেই আমার সমস্ত দিন কেটে যায়।

রোজ রোজ অত কার জামা সেলাই করো ?

এই বস্তির ছেলেমেয়েদের। অবশ্য তাদের ক্ষমতা মত পারিশ্রমিক দেয়।

হুঁ! স্বাধীন জেনানা! নিজের জীবিকা নিজেই চালাচ্ছো। সুশীলের ওপর তোমার রাগ হয় না বৌদি?

আশ্চর্য হয়ে বন্দনা জিজ্ঞাসা করে—কেন?

এই স্ত্রীর প্রতি সে তার কর্তব্য পালন কোরছে না!

পুরুষের স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য ছাড়া আর কি কোন কর্তব্য নেই?

সে কথা আমি বোলছি না। তবে তোমার প্রতি সুশীলের কি কোন কর্তব্য নেই?

দামী গয়না আর দামী শাড়ী স্ত্রীকে দেওয়া যদি পুরুষের প্রধান কর্তব্য হয়, তাহলে তিনি কর্তব্যচ্যুত হয়েছেন। ঠাকুরপো, তুচ্ছ অর্থ

সুখের চেয়ে তিনি আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন, সে তুমি বুঝবে না। একটা কথা কি জানো, ভাই—পুরুষেরা মেয়েদের স্বাধীনতা বোলে মুখে যতই চীৎকার করুক, আসলে তারা মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়াটা ঠিক সহ্য কোরতে পারে না।

তারক হাসতে হাসতে বলে—বৌদি দেখছি আমার ওপর খুব রেগে গেছ। তা সেটা স্বাভাবিক। পতির নিন্দা কে সহ্য করতে পারে?

তোমাদের ওপর কি রাগ কোরতে পারি, ভাই। তোমাদের দুঃখ কষ্টের কাছে আমার এতো স্বর্গবাস। ঠাকুরপো, তোমাদের কষ্টের কবে অবসান হবে?

তা জানি না, বৌদি। এ দুঃখনিশার অবসান হবেই একদিন। তোমাদের মত নারীর স্বার্থত্যাগে, অবরুদ্ধ নারীর বেদনার পুঞ্জীভূত অশ্রুরাশিতে…কত শহীদের তপ্ত বক্ষোরক্তে এই অত্যাচারী শাসকের বিধিব্যবস্থার হবে অবসান।

দুজনের মধ্যে ক্ষণতরে নীরবতা নেমে আসে। ভবিষ্যৎ দিনের ছবি তাদের সামনে ভেসে ওঠে। সুশীল প্রবেশ করে।

ব্যাপার কি? দুজনে চুপচাপ বসে? রহস্য কোরে সুশীল বলে—বন্দনা বুঝি ঝগড়া কোরেছে? জানি, কোরবে। ওর ঐ ঝগড়ার জন্যই ত বাড়ী থাকতে ভাল লাগে না।

যা বোলেছিস, ভাই। মুখভার কোরে তারক বলে—যা ঝগড়াটে বৌ কোরেছিস। নেহাৎ তুই আসতে বোলিস, তাই এখনও আসি!

বন্দনা বলে—দেখো, আমার সামনে আমার নামে যা তা বোলো না।

সুশীল বলে—আমরা ত আর কাপুরুষ নই যে, পেছনে বোলবো।—আমরা বীর, যা কিছু বলি সামনা সামনিই বলি। তোমার যদি শুনতে ভাল না লাগে, চলে যেতে পারো।

বেশ! আমি চললাম। বন্দনা কৃত্রিম রাগ কোরে বলে—

এইবার দুই বন্ধুতে মিলে যত পারো আমার নিন্দা করো।—তারক আর সুশীল হো হো করে হেসে ওঠে।

সুশীল বলে—এই দেখো! চলে যাচ্ছো কেন? শোনো, শোনো। বন্দনা লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরথেকে বার হয়ে যায়।

সুশীল বলে—আমাদের কাজের কথাটা শোনো, তারক।

বলো।

তোকে আমাদের পার্টির প্রচার বিভাগের ভার দেওয়া হয়েছে। তাই তোকে এবার থেকে সম্পূর্ণভাবে কাজে আত্মনিয়োগ কোরতে হবে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তোর ওপর পুলিসের নজর পড়েছে—তোকে এবার আত্মগোপন কোরতে হবে।

একটা কথা। সবাই যদি আত্মগোপন করে তাহোলে জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় কার সঙ্গে থাকবে?

সকলকে যে গা ঢাকা দিতে হবে এ কথা কে বোললে? তাছাড়া একি কখনও সম্ভব। তবে কিছু লোকের গুপ্তভাবে কাজ করবার প্রয়োজন আছে, কারণ আমরা যে সব মত ইস্তাহারের দ্বারা বিলি করি। লোকের কাছে যা প্রচার করি তা কি প্রকাশ্যে সম্ভব? একদিন প্রকাশ্য-ভাবে কোরলেই জেলে যেতে হবে। জলে পচে মরবার জন্যই কি আমরা এই পথে নেমেছি? গুপ্তভাবে যেমন আন্দোলনের দরকার, প্রকাশ্যভাবে মাঠে জনজাগরণের ক্ষেত্র কোরে চলেছে একদল, আর আমরা সেই ক্ষেত্রে নৈশ অন্ধকারে বিপ্লবের বীজ বুনে চলেছি। আমাদের পার্টি বে-আইনী। তাছাড়া তুই ত জানিস তারক, আমার ভিন্ন ভিন্ন নামে তিনখানা ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। তুই কি বোলতে চাস। আমি গুপ্তভাবে কাজ না কোরে ধরা দিয়ে জেলে গিয়ে শরীরের ওজন কমাবো?

তারক বলে—আচ্ছা, তোর কথা মতই কাজ কোরবো। আর কিছু বলবার আছে?

না। হ্যাঁরে, তারক, রাস্তায় পোস্টার দেখি, কি একটা বই যেন—তোর নামে লেখকের নাম—কোথায় যেন দেখানো হচ্ছে।

ওটা আমারই লেখা বই।

তাই নাকি। আমাকে ত কৈ আগে বলিস নি।

তোর সঙ্গে দেখাই বা হয় কতবার। আর দেখা হোলে কটাই বা কথা হয়!

তা যা বলেছিস। সুশীল হেসে বলে—কি বিষয়ে বইটা লিখেছিস?

এই আধুনিক ব্যাপার নিয়ে আর কি।

চল, তোর বইটা আজ দেখে আসি।

তুই সিনেমা দেখতে যাবি।

সিনেমা দেখতে নয়—তোর বইটা দেখতে।

সুশীল চেঁচিয়ে ডাকে—বন্দনা! বন্দনা!

কি? বন্দনা প্রবেশ করে।

চলো, আজ সিনেমা দেখতে যাবো।

বুঝেছি।—বন্দনা বলে, ঠাকুর পো বোধ হয় বোলেছে, তুমি আমায় গয়না দাও না, সিনেমা দেখাও না, ভাল শাড়ী দাও না।

না গো না। সুশীল বলে—কথায় বলে না, চোরের মন…

বন্দনা বলে—দেখো, আমাকে যতটা বোকা ভাবো ততটা বোকা আমি নই। এই কিছুক্ষণ আগে ঠাকুরপো আমাকে বোলছিল, তুমি আমার ওপর তোমার কর্তব্য পালন কোরছ না। বোধ হয় ঠাকুরপো তোমাকেও বোলেছে ঐ কথা। আর তুমি অমনি লাফিয়ে উঠেছ চলো সিনেমা!

সুশীল বলে—এইবার তোমার কথা শেষ হোলোত। আচ্ছা, শোনো আমার কথা। তারকের লেখা বই সিনেমায় দেখানো হচ্ছে। বুঝেছ?

ও তাই বলো!—খুসিতে বন্দনার মন ভরে ওঠে।

'ও তাই বলো!' সুশীল বলে—আগে সব কথা শুনবে, তা নয়, যেই শোনা কাকে কান নিয়ে গেছে, অমনি কাকের পেছন পেছন ছুটেছে—

আরে আগে কানে হাত দিয়ে দেখো যে সত্যিই কাকে কান নিয়ে গেছে কি না।

সুশীলের কথা শুনে তারক আর বন্দনা তুজনেই জোরে হেসে ওঠে।

তাহোলে তৈরী হয়ে নাও।—সুশীল বলে।

বন্দনা একটু চিন্তিত ভাবে বলে—কিন্তু একটা মুস্‌কিল হয়েছে।

কি হোলো ?

কাপড় নেই।

এই ত কাপড় পরে রয়েছ।

এই ময়লা কাপড় পরে কি আর লেখকের সঙ্গে যাওয়া যায় ? ঠাকুরপোর ত ওখানে একটা সম্মান আছে।

তারক বলে—না, বৌদি, কারু সম্মান প্রত্যাশী আমি নই। আমার মান নিজের কাছে।

ও কথা বোললে কি চলে ?

কেন চলবে না।

আজ আর গিয়ে দরকার নেই।

সুশীল বলে—পরে কি আর সময় পাবো নাকি ? আজ হাতে কোন কাজ নেই—আজই যেতে হবে। বন্দনা, তোমার বিয়ের কাপড়টা কি হোলো ?

সে আমি ও বাড়ীর মেয়েটির বিয়েতে দিয়ে দিয়েছি। না দিলে কাপড়ের অভাবে চিত্রার বিয়েই হোতো না।

তা হোলে উপায় ?

একখানা কাপড় আছে, তবে এক জায়গায় একটু ছেঁড়া।

উৎসাহের সঙ্গে সুশীল বলে ওইটাই ঘুরিয়ে পরলে চলবে না ?

তা চলতে পারে।

ব্যস্, তা হোলে চলো।

বন্দনা বলে, রান্নাঘরে এসে তুজনে কিছু খেয়ে নাও।

ঘোড়ার কাছে এসে গাছের ডাল থেকে লাগামটা খুলে হাতে নেয় শান্তিদেব। হঠাৎ কাছের একটা বাড়ী থেকে চীৎকার ও মারধোরের শব্দ শোনা যায়। ঘোড়ার লাগামটা আবার ডালে বেঁধে শান্তিদেব বাড়ীটার কাছে এগিয়ে যায়। দরজার ওপর জোরে আঘাত কোরে শান্তিদেব ডাকে—

জহর! জহর!

ভেতরের চেঁচামেচি যেন ক্ষণেকের জন্য একটু স্তিমিত হয়। ভেতর থেকে শব্দ আসে জড়িত কণ্ঠের—

কে বাপজান তুমি?

দরজা খোলো—আমি শান্তিদেব।

ওসব বুজরুকি চলবে না। এখান থেকে সরে পড়ো! খবরদার, না! দরজা খুলো না। খুললে একেবারে জানে মেরে দেবো।

বার থেকে শান্তিদেব বলে—মদ খেয়ে আর মাতলামো করিসনি—ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়্‌গে যা।

মদ খেয়েছি! বেশ কোরেছি। তোমার বাড়ীতে ত আর মাতলামো কোরতে যাই নি। আমি আমার বাড়ীতে আমার বিবিকে মারছি, মাকে মারছি—কাউকে গলা বাড়াতে হবে না! হুঁ!

না। এখানে থেকে কোন লাভ নেই।

শান্তিদেব ঘোড়ার কাছে ফিরে গিয়ে লাগাম খুলে হাতে নেয়।

বাবু!

কে?

আমি আমিনা—জহরের বিবি।

ওঃ, তা কি বোলছ?

আমার একটা বন্দোবস্ত কোরে দাও। এমনি ভাবে রোজ রোজ অত্যাচার আর সহ্য কোরতে পারি না।

শান্তিদেব বলে—জহরকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিকে কোরলে ত পারো।

সবাই সমান।

না, তা নয়। আলি ভাইয়ের কাছে যাও। সে হয়ত কোন বন্দোবস্ত কোরে দিতে পারে।

ওর কাছে যাবো ত তোমাকে বোলতে এলাম কেন?

কিন্তু আমি কি করি বলো? খারাপ লোকের অভাব নেই—তোমার ধর্মের লোক ছেড়ে আমার কাছে তুমি অভিযোগ কোরতে এসেছ—এই নিয়ে হয়ত হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা লেগে যেতে পারে অবশ্য সে সম্ভাবনা খুবই কম।

বুঝেছি তুমি কিছু কোরতে পারবে না।

আমিনা চলে যায়।

শান্তিদেব আবার শের আলির বাড়ী যায়, আশ্চর্য হোয়ে শের আলি জিজ্ঞাসা করে—

আবার এলে যে?

শান্তিদেব আমিনার সব কথা খুলে বলে। শের আলি একটু গম্ভীর হয়ে বলে—আমার কাছে এর আগে আমিনা কয়েকবার এসেছিল।

তুমি একটা ভাল ছেলে দেখে আমিনার···

আমি তাই চেয়েছিলাম। শের আলি বলে—কিন্তু তাতে রাজি নয়।

তবে ওকি চায়?

সেই ত হয়েছে মুস্কিল। তোমায় ব্যাপারটা খুলেই বলি।—ও আমায় নিকে কোরতে চায়।

তাই নাকি!

হাঁ, কিন্তু তা কি কোরে সম্ভব বলো। আমার বিবি রয়েছে, ছেলে রয়েছে। তাছাড়া···

জানি ভাবীতে আর তোমাতে খুব ভালবাসা।

হাঁ ভাই। একথা আমি আমিনাকে জানাই, তাতে ও বলে,

নিকে না করো আমায় ভাল বাসতে ক্ষতি কি। কিন্তু ভাই, তা কি হয়। একজন পরের বিবির সঙ্গে অবৈধভাবে প্রণয় কি ভাল? তাছাড়া আমার বিবি...

চলি, আলি ভাই। পরে যা হয় একটা কিছু করা যাবে।

এস ভাই।

বাড়ীর পথে ফিরতে ফিরতে শান্তিদেব ভাবে যে, কি ভাবে এই অসহিষ্ণু লোকদের সংযত কোরে ঠিক পথে নিয়ে যাবে। শের আলি একটু গোঁয়ার—এই সন্দেহেই আজ সে গাজীপুরে গেছিলো। যদি সে আজ না যেত তাহোলে এতক্ষণে কি কাণ্ডটাই না হোতো! সরকার ত এই চান। ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গ নিভিয়ে দেওয়া সহজ। কিন্তু সরকারের ফাঁদে পা দিলে চলবে না—সারা ভারতবর্ষব্যাপী আনতে হবে এককালীন বিরাট্ আন্দোলন। বিরাট্ দেশ এই ভারত। কাজটা বড়ই শক্ত। কিন্তু এই দুরূহ কাজ সফল কোরতেই হবে। হঠাৎ মনে পড়ে আমিনার কথা। না আমিনার কোন দোষ নেই। ব্যভিচারী মাতাল স্বামীকে পরিত্যাগ কোরে শের আলির মত মহৎ লোকের সান্নিধ্য চাওয়া স্বাভাবিক। জহুরটাই বা কি? অমন সুন্দর বৌয়ের ওপর অত্যাচারই বা করে কেন? শিক্ষার অভাব না পরাধীনতা? স্বাধীনতা ছাড়া উপায় নেই।—মুক্তি চাই—মুক্তিবোধ।

জঙ্গল পার হয়ে শান্তিদেবের ঘোড়া মাঠের দিকে তীরবেগে ছোটে।

শান্তিদেবের বাড়ী পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে যায়। আস্তাবলে ঘোড়া রেখে সে ওপরে উঠে আসে। সামনের ঘরে আলো জ্বলছিল। তারই একটু আলো দরজা দিয়ে বারান্দায় পড়েছিল। বারান্দায় পা দিতেই ঘরের ভেতর থেকে প্রশ্ন আসে—

শান্তি এলি?

হাঁ, বাবা।

বাবা বার হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেন—কোথায় গেছিলি ?

গাজীপুর।

সে ত অনেকদূর। কি কাজে গেছিলি ?

কোলকাতায় গুলি চালানোর জন্য ওখানকার চাষীরা সব ক্ষেপে উঠেছে। তাদের উপস্থিত শান্ত হোতে বোলে এলাম।

তোর কি মনে হয়, এবার দেশ সত্যই স্বাধীন হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাবা। মা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন ? আমার খিদে পেয়েছে।

তোর মা ধনপতির বাড়ী গেছে।

রমাদের বাড়ী ! হঠাৎ এত রাত্রে !

ধনপতি সন্ধ্যায় মারা গেল।

অ্যাঁ !

যাক, মারা গিয়ে সে শান্তি পেয়েছে। তুই ত জানিস, অতি ছোট থেকে ধনপতির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। যখন আমাদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল, বাবা কোলকাতায় একটা দোকানে সামান্য চাকরি কোরতেন। অত বড়লোক হয়েও ধনপতি আমায় ভাল বাসতো। সে আমার কত উপকারই না কোরেছে। আমাদের সৌভাগ্যের মূল ঐ ধনপতি। ঐ বাবাকে ধার নিয়ে ব্যবসা কোরতে বোলেছিল। তারপর আমাদের অবস্থা ফিরলে টাকা ফেরৎ দিতে গেলে নেয়নি। শেষে ঐ টাকায় গাঁয়ে টিউবওয়েল হয়। বাবার ব্যবসা অবশ্য আমি রাখতে পারিনি। বিক্রি কোরে দিয়ে জমিদারী কিনি।

এ সব কথা আমি জানি, বাবা।

মৃত্যুর সময় সে আমার হাত ধরে বোললে—সীতানাথ, আমি চল্লাম, আমার রমাকে আর বৌমাকে দেখো।—সীতানাথ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বোলতে থাকে তোর মত না নিয়েই ধনপতির কাছে কথা দিয়েছি রমাকে আমি পুত্রবধূ কোরবো। তুই রাজি আছিস ত ?

শান্তিদেব বলে—এসব কথা এখন যাক, বাবা। আমার এখন শ্মশানে যাওয়া উচিত।

সীতানাথ বলে—শ্মশান থেকে সকলে এসেছেন। আমিও সেখানে গেছিলাম। এই কিছুক্ষণ আগে ফিরেছি।

তাহোলে ওদের বাড়ী একবার যাব কি ?

যেতে ইচ্ছা হয় যাও, তবে বামুন পিসীকে ডেকে খেয়ে যাও।

খেতে আমার ইচ্ছা নেই বাবা।

তবে যাও, কিন্তু ধনপতির কাছে আমি যে কথা দিয়েছি তা কি সত্য হবে না ?

আপনাকে সত্যচ্যুত কোরতে পারি, এ ধারণা আপনার এল কোথা হোতে, বাবা ?

শান্তিদেব !—সীতারাম বলে—আমি আশীর্বাদ কোরছি তুই অনেক বড় হবি। দশজনের ভেতর মাথা উঁচু কোরে দাঁড়াবি।

শান্তিদেব বলে—বড় হোতে আমি চাই না, বাবা। দশজনের একজন হয়েই থাকতে চাই। বড় হোলে ছোটদের কথা আর আমি ভাববো না।

সীতানাথ ধীর ভাবে বলে—তোকে আশীর্বাদ করবার মত শক্তি নেই—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোর মঙ্গল হোক।

হেঁট হয়ে শান্তিদেব পিতার পদধূলি মাথায় নেয়।

সিনেমা দেখে ফেবার পথে সুশীল তারককে বলে—বেশ বই লিখেছিস, তারক। তবে একটা কথা আমি ভাবছি ভাই।

কি ?

আমাদের এই বিপদ্‌সঙ্কুল পথে তোর না এলেই হোত।

বাজে কথা বকিস নি।

তুই লেখক—সাহিত্য-ক্ষেত্রেই তোর প্রতিভার যথার্থ বিকাশ হোতো।

এ তোর ভুল ধারণা, সুশীল। যে পথে আজ আমি যাত্রা কোরছি, ঐ আমার উপযুক্ত পথ। আজকের সাহিত্য রাজনীতির সঙ্গে গণ-জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। তাই যাদের নিয়ে আজকের সাহিত্য তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা কি কোরে জানবো—তাদের একজন না হোতে পারলে। —এই যে তোদের ট্রাম এসে গেছে—উঠে পড়।

বন্দনা বলে—আসি ভাই, ঠাকুরপো। যেও আমাদের বাড়ী একদিন।

যাবো।

সুশীলদের বিদায় দিয়ে তারক কিছুক্ষণ চুপ কোরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। রাত এই ত সবে নটা হবে। এর মধ্যে বাড়ী গিয়েই বা কি হবে। হঠাৎ মনে পড়ে নন্দিনীর কথা। তার বাড়ীতে আর একদিন আসবে বোলে সে কথা দিয়েছিল—আজই যাওয়া যাক। নন্দিনীর বাড়ীর দরজার কাছে এসে তারক থমকে দাঁড়ায়। ভেতরে নন্দিনী উত্তেজিত ভাবে কার সঙ্গে কথা কইছে।—না, না, আমি যাবো না; তুমি চলে যাও এখান থেকে।'

পুরুষকণ্ঠে অপর একজন বলে—'থাকতে আমি আসিনি। চলেই আমি যাবো—তবে যাবার আগে এই জঘন্য জীবনযাপন থেকে তোমাকে নিয়ে যাবো?'

'জঘন্য জীবন তুমি কাকে বোলছ? —নন্দিনী বলে, 'এই হোচ্ছে সুখের জীবন। আজ আমার খাওয়া পরার কোন কষ্ট নেই।'

'অবুঝ হোয়না নন্দিনী। দোষ আমি কোরেছি, স্বীকার কোরছি। তার জন্য যে শাস্তি হয় তুমি আমাকে দাও—আমি মাথা পেতে নেবো। —কিন্তু এ যে তুমি নিজে শাস্তি নিচ্ছো। ভুল কোরে, তোমার কথা না ভেবে, পেটের জ্বালায়, তোমাকে না জানিয়ে যুদ্ধে চলে গেছলুম। মাইনে পেয়ে তোমার নামে টাকা পাঠালাম, টাকা ঘুরে চলে এল। বুঝলাম, তুমি ওবাড়ী ছেড়ে অন্য কোথায়ও গেছ। আমি তখন তোমার খোঁজ করবার কোন চেষ্টাই কোরতে

পারলাম না, কারণ আমি তখন সুদূর বর্মায়। ইংরেজ হেরে গেল বর্মায়, আমরা হোলাম জাপানীদের বন্দী। তারপর এক শুভদিনে এল ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য নেতাজীর আহ্বান। যোগ দিলাম আজাদ হিন্দ ফৌজে। কিন্তু ইংরেজদের সৌভাগ্য আর আমাদের দুর্ভাগ্য যে, রসদের অভাবে আবার আমরা বন্দী হোলাম ইংরেজদের হাতে। নির্যাতন চলেছিল আমাদের ওপর প্রচুর। এই কিছু আগে মুক্তি পেয়ে এলাম কোলকাতায় তোমার খোঁজে। 'এত বড় সহরে তোমার কোন সন্ধানই কোরতে পারিনি। শেষে সেদিন সিনেমা দেখতে গিয়ে ছবির পর্দায় তোমাকে দেখে চমকে উঠি। —কে ?

অন্যমনস্ক হয়ে তারক কড়াটা নেড়ে ফেলেছিল। নন্দিনী দরজা খুলে দিয়ে তারককে দেখে বোলে ওঠে—

তারকবাবু !

হাঁ, ভদ্রলোকের কথা শোনো, বোন।

ভদ্রলোক আশান্বিত হয়ে বলেন—আমার কথা কিছুতেই শুনছে না। আপনি আমার হয়ে ওকে একটু অনুরোধ করুন।

নন্দিনী বলে—কাউকে অনুরোধ কোরতে হবে না। আমি যাবো না। তাছাড়া আমাদের দুজনের কথার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির কথা আমি পছন্দ করি না।

তারক বলে—বেশ, আমি চলে যাচ্ছি। তবে একটা কথা বোলে যেতে চাই যে, একদিন এ পথ থেকে তুমি আমার কাছে মুক্তির উপায় জানতে চেয়েছিলে। আর সেই মুক্তির উপায় যখন তোমার কাছে আপনা থেকে উপস্থিত হোলো তখন তুমি তাকে প্রত্যাখ্যান কোরছ। তাই আমার এই শেষ মিনতি, বোন, ভুল কোরো না।

তারক ঘর থেকে চলে যায়।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করে—ভদ্রলোকটি কে ?

যেই হোক, তোমার কি প্রয়োজন।

প্রয়োজন আমার কিছুই নেই। তবে ভদ্রলোকের চেহারায় আর

কথায় মনে হোলো কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আরও আশ্চর্য লাগলো, ভদ্রলোক তোমায় বোন বলে সম্বোধন করলেন।

বেশি কথায় কাজ কি, তুমি এখন যেতে পারো।

নন্দিনী ফিরিয়ে আমায় দিও না। নেতাজীর কাছে আমরা শপথ কোরেছি ভারতের স্বাধীনতা না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম গ্রহণ কোরবো না। তাই আমার ইচ্ছা ছিল, তোমাতে আমাতে তুজনে একসাথে দেশের সেবা কোরবো। আমার নিজের আত্মসুখের জন্য তোমায় আমি আহ্বান কোরছি না। আমি একজন সৈনিক। দুঃখ কষ্টকে আজ আর আমি ভয় করি না।

দারিদ্র্যকে আমি ঘৃণা করি। —নন্দিনী বলে।

এ তোমার মনের কথা নয়, নন্দিনী। সৈনিক বলে—তোমার যতখানিই পরিবর্তন হোক না কেন, এতবড় পরিবর্তন তোমার কখনও হোতে পারে না। আমার সামনে বিশ্বের এক জ্যোতির্ময় দ্বার খুলে গেছে—আজ আমি পেয়েছি মুক্তির সন্ধান—মুক্তির আহ্বান। তোমাকেও সেই আহ্বান শোনাতে এসেছিলাম। কেন জানি না, তুমি সে আহ্বানে সাড়া দিলে না। দেশের এই স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা চেয়েছিলাম তোমাকেও একজন সৈনিক হিসাবে। কিন্তু তা হোলো...

নন্দিনীর চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। সে আকুল স্বরে বলে—আমি পাপী, নীচ, ঘৃণ্য...

সৈনিক বলে—হোলেই বা তুমি পাপী, নীচ—বিগ্রহ স্পর্শ করবার হয় ত আমাদের অধিকার নেই, কিন্তু প্রসাদের অধিকারী ত সকলেই।

না, না, না। —নন্দিনী আছাড় খেয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে।

সৈনিক ধীরে ধীরে বলে—আমি চল্লাম। রেখে গেলাম আমার তথা দেশ জননীর আহ্বান। জয় হিন্দ।

বাড়ী ফিরে তারক দুখানা চিঠি পায়। একখানা সুদৃশ্য—ওপরে লেখা শুভবিবাহ। কে আবার বিয়ের নিমন্ত্রণ কোরে গেল? খামটা খুলে দেখে, সুমিত্রার সঙ্গে শিবশংকরের বিবাহের নিমন্ত্রণ চিঠি। আর সেই সঙ্গে দুখানি ছোট ছোট চিরকুট—সুমিত্রা ও শিবশংকরের হাতে লেখা। দুইটিরই ভাবার্থ—কদিন থেকে তারা তারকের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা কোরছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তারকের দেখা তারা পাচ্ছে না। কাল বিকালে তারক যেন অবশ্যই বাড়ী থাকে, তারা দুজনে আসবে দেখা কোরতে। শিবুর সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে। ভালই হোল। তারক অপর খামটা খুলে ফেলে।

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু মারা গেলেন। আপনি এলেন না। ঠাকুরঝির বিয়েতে আপনি এলেন না। অথচ ঠাকুরজামাই আপনার ওখানে গিয়ে এখানে একবার আসবার জন্য কত অনুরোধ কোরেছিলেন। আমাদের সঙ্গে আপনি কোন সম্পর্কই রাখতে চান না। অবশ্য ঠাকুরজামাই আপনাকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে আপনি তাঁকে বোলেছিলেন যে ইচ্ছা হোলে আমি আপনার কাছে গিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু তাও কি কখনও হয়। আমি চলে গেলে শ্বশুরে ভিটেয় আলো জ্বলবে না, ঠাকুরের সেবার ব্যাঘাত হবে। এত বড় বাড়ীতে আমি আর বামুনপিসী থাকি। আমার মা বড়লোকের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কাশীবাসী হয়েছেন। শুনেছি আপনি স্বদেশী করেন; ঠাকুরজামাইও স্বদেশী করেন। কিন্তু তিনি ত আপনার মত বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেননি। বেশি আর কি লিখবো। আপনার আশায় পথ চেয়ে রইলাম।

সেবিকা
রমা

চিঠি পড়ে তারক কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে। না, এ বাড়ী তাকে ছাড়তেই হবে।

রামু। রামু! তারক উচ্চস্বরে ডাকে। রামু ঘরে প্রবেশ কোরে বলে—

খেতে দেবো?

না, তোমাকে কাল দেশে যেতে হবে।

আনন্দের সঙ্গে রামু বলে—

সে ত ছোটবাবু, আমার অনেক দিনের ইচ্ছা।

বাড়ীর সমস্ত মালপত্র নিয়ে যেতে হবে। আজই সব বন্দোবস্ত কোরে নাও। এ বাড়ী আমি ছেড়ে দেবো।

তুমিওদেশে যাবে তো?

না। আমি এখানে এক বন্ধুর বাড়ী থাকবো।

আশ্চর্য হয়ে রামু বলে—সে কি ছোটবাবু! তবে আমি যাব না—তোমার কষ্ট হবে।

তারক একটু রুক্ষকণ্ঠে বলে—হোক আমার কষ্ট। তোমাকে যেতেই হবে। আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। পয়সার বড় অভাব। এতবড় বাড়ী ভাড়া কোরে রাখবার আমার সঙ্গতি নেই।

শুনলাম, বাইস্কোপ থেকে কিছু টাকা পেয়েছ।

সে টাকা অন্য কাজে খরচ হবে। বেশি কথা বাড়িও না, যা বোলছি তাই করো।

তা হোলে এ বাড়ীখানি ছেড়ে যাব?

আবার নোতুন ভাড়াটে আসবে।

পরদিন সকাল। এই একটু আগে জিনিষপত্র নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রামু বাড়ী ছেড়ে দেশের পথে রওনা হয়েছে। তারককেও এবার বাড়ী ছাড়তে হবে। কেমন যেন মায়া লাগে এই বাড়ীটার ওপর। অতি

শৈশব থেকে এতখানি জীবন কেটেছে তারকের এই বাড়ীতে—কত সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু মিশে আছে এ বাড়ীর প্রতিটি ইষ্টকে। অতীতের কত কথাই আজ মনে পড়ে। মা আজ কোথায়? মালতী, মায়া, সুমিত্রা, শিবশংকর, বিষ্টু...একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তারক সুটকেশ হাতে উঠে দাঁড়ায়!

তারকবাবু আছেন?

কে?

আমি বিমলেন্দু।

তারক বাইরে বার হয়ে জিজ্ঞাসা করে—কি খবর, বিমলেন্দুবা ?

আগামী রবিবার আমাদের সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন। আপনাকে সভাপতিত্ব কোরতে হবে।

আমাকে ক্ষমা কোরবেন। সেদিন আমি থাকতে পারবো না।

কোথাও যাবেন নাকি?

হাঁ, আজই যাবো। তাছাড়া, থাকলেও আমি যেতাম না, কারণ সেদিন আপনারা আমাকে যে রকম অবস্থায় ফেলেছিলেন!

বিনয়ের সঙ্গে বিমলেন্দু বলে—কি যে বলেন! আপনার প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান...

তারক বলে—দেখুন, পাগলামীর একটা সীমা আছে। আমার নামে গান লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন, আবার প্রবন্ধও লিখেছেন। আমার মত একজন সামান্য লেখককে নিয়ে ঐ রকম মাতামাতি কোরলে যারা সত্যই বড় লেখক তাঁদের অপমান করা হয়। আচ্ছা, আমি একটু ব্যস্ত আছি।

বিমলেন্দু বিব্রত হয়ে বলে—আগে বোলতে হয়, নমস্কার।

নমস্কার।

বাড়ীর দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা পাশের দোকানদারকে দিয়ে সেটা বাড়ীওলাকে দিতে বোলে তারক ট্রামের রাস্তার উদ্দেশে পথ

ধরে। ট্রাম-ষ্টপেজে এসে তারক ট্রামের জন্য অপেক্ষা করে। বোধ হয় দূরে লাইনে কিছু গোলমাল হওয়ার জন্য ট্রাম আসতে বিলম্ব হোচ্ছিলো।

নমস্কার। কেমন আছেন। একটি ভদ্রলোক তারককে জিজ্ঞাসা করে। প্রতি নমস্কার কোরে তারক লোকটির দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকায়।

আমায় চিনতে পারছেন না? আমি হলুদপুরের স্টেশান মাষ্টার···

ওহো! এইবার মনে পড়েছে। তারপর আছেন কেমন? কোলকাতায় কি মনে কোরে?

হেঁ, হেঁ, ভালই আছি। উপস্থিত কোলকাতাতেই আছি। হলুদপুরের চাকরিটা গেল কি না।

কি রকম?

মাষ্টারমশাই বলেন—একটা মালগাড়ীর একসিডেণ্ট হোয়েছিলো। ব্যাটা সিগন্যালম্যান মদ খেয়ে কি টানতে কি টেনে দিয়েছিলো। তার পরেই ঐ কাণ্ড। তখন ব্যাটার মদের নেশা ছুটে গেছে। আমার পা জড়িয়ে ধোরে বলে, আমায় বাঁচান, বড়বাবু। অনেকগুলো কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করি।' তা কি করি, অনেক চেষ্টা কোরে ব্যাটাকে বাঁচালাম···

তারক বলে—কিন্তু নিজের চাকরিটা বাঁচাতে পারলেন না।

হেঁ, হেঁ, বুঝতেই পারছেন। সবই তাঁর ইচ্ছা, আমরা আর কে বলুন না—নিমিত্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখন কি কোরছেন?

এই একটা মুদীর দোকানে খাতা লেখা কাজ পেয়েছি। ট্রাম ত আসছে না, আসুন না আমাদের বাড়ীতে। এই কাছেই।

এখন আর হয় না—একটু কাজ আছে।

ওঃ। পরে একদিন সুবিধা মত আসবেন। এই সামনের গলিটার শেষের ১০ নম্বর বাড়ী। আসবেন, কেমন।

চেষ্টা কোরবো। আচ্ছা নমস্কার

নমস্কার।

তারক জনতার মধ্যে মিশে যায়।

বারান্দায় বসে শিবশংকর আর সুমিত্রা। সুমিত্রা একটু উদ্বেগের সঙ্গে বলে—

কদিন থেকে যেন তোমাকে উৎসাহ হীন বোলে মনে হোচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের ওপর একটা গুরুভার চেপে আছে।

কই না।

আমার কাছে লুকিয়ো না। আমাদের বিয়ের আগে এবং পরেও কিছুদিন যেমন তোমার মুখে হাসি-খুসিতে ভরে থাকতো, এখন আর তা নেই।

এর মানে অতি সহজ। বিয়ের আগে তোমার প্রতি আমার যে কৌতূহল ছিল তা নিবৃত্ত হয়ে যাওয়ায় বোধ হয় আমার এই ভাবান্তর।

বাজে কথা বোলে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা কোরো না। লক্ষ্মীটি, বলো তোমার কি হয়েছে?

হবে আবার কি।

তবে কি তুমি, আমায় বিয়ে কোরে সুখী হওনি?

এ কথা বোলো না, সুমিত্রা। তোমায় কোন দিন পাবো, এ আমার কল্পনার বাইরে ছিল। তাই এ আমার কল্পনাতীত সৌভাগ্য। আসল কথা কি জান—ছাত্র-জীবনে বন্ধুদের সঙ্গে টেবিল চাপড়ে ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে কত আলোচনাই না কোরেছি। ছাত্রজীবন শেষ হবার পরও চায়ের দোকানে, ক্লাবে, খেলার মাঠে দেশের জন্য সব কিছু কোরতে প্রস্তুত—এমনি কত উত্তেজনার কথা না বোলেছি। কিন্তু আজ যখন সত্যই এল দেশের ডাক তখন আমি নিষ্ক্রিয়। গত নভেম্বরে কোলকাতায়, ২৩শে জানুয়ারী বোম্বাইয়ে নেতাজীর জন্মদিনের উৎসব-

উপলক্ষে হাঙ্গামা হয়, গত দুদিন থেকে আবার দেখা দিয়েছে কোলকাতার বুকে মৃত্যুর তাণ্ডব—রক্তের আহ্বান। তবু আজও আমি নির্বিকার। পিতার সঞ্চিত অর্থে নিশ্চিন্তে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ কোরছি। অতীত দিনের স্বপ্ন কোথায় গেল? নির্ভীক বন্ধুরা আজ আমায় পরিত্যাগ কোরেছে। তারকও আমায় ছেড়ে চলে গেছে। এ আমার অক্ষমতার লজ্জা।...

উত্তেজিত ভাবে শিবশংকর পায়চারি কোরতে থাকে।

১৯৪৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম অফিসার কাপ্তেন রসিদ আলির ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বার হয়েছিল এক মিছিল। পুনরায় হয় গত নভেম্বরের পুনরাবৃত্তি সাম্রাজ্যবাদের মুখোস যায় খুলে। চলে নিরীহ জনসাধারণের ওপর নির্বিকার গুলিবর্ষণ। হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে সহর থেকে সহরতলীতে। বন্ধ হয় সমস্ত দোকান-বাজার। বন্ধ হয়—ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি ট্রেণ।...

শিবশংকর মৃদুস্বরে ডাকে—

সুমিত্রা।

সুমিত্রা উৎসুক নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়। শিবশংকর বোলতে থাকে—

আমরা এমন এক সমাজে বাস করি, যে সমাজে অর্থ ছাড়া আর কোন কিছুরই মূল্য নেই। পার্টিতে, মজলিশে আছে ওজন করা ফাঁকা হাল্‌কা কথার বুকোনি। এরা সমাজ, দর্শন, সাহিত্য, প্রেম নিয়ে অনেক চর্চা করে। অথচ কোন চর্চার মধ্যেই নেই কোন আন্তরিকতা। আজকাল অনেকে সখ কোরে একটু আধটু রাজনীতির আলোচনা সুরু কোরেছে কিন্তু সে অত্যন্ত বুঝে সুঝে—জাতীয় সমস্যা চাইতে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আলোচনাতেই তারা বিভোর। দেশ ছেড়ে বিদেশীয় রাজনীতির আলোচনার ধারাটা এনেছে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! যে পার্টি হওয়া উচিত ছিল সর্বহারাদের সেই পার্টিই হয়ে বসেছে সুবিধাবাদীদের বিলাসিতার একচেটে সম্পত্তি। এদের কথা

শুনে হাসি পায়। আবার দুঃখও হয়। এরা শুধু ভারতেরই মুক্তি নিয়ে মাথা ঘামায় না। এরা চায় পৃথিবীর মুক্তি। অথচ এরা বোঝে না ভারতের মুক্তির সঙ্গে শোষিত পৃথিবীর মুক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মনে করো '৪২ সালের আন্দোলনের কথা। সে সময় এরা ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, ইংরেজের গলায় গলা মিলিয়ে বেশ স্পষ্টভাবেই উচ্চারণ করলেন যে এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ। সুতরাং এই যুদ্ধের প্রচেষ্টাকে যে যেভাবেই বাধা দিক বা নিশ্চেষ্ট থাকুক সে-ই ফ্যাসিষ্ট বা 'পঞ্চম বাহিনী। এতদূর নির্লজ্জ যে, নেতাজীকে পর্যন্ত কুইস লিং বোলতে সাহস পায়।

সুমিত্রা সংযতভাবে বলে—আমাদের কি কোরতে বলো।

সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা কোরছ! আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও যে তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা কোরছ, এ দোষ তোমার নয়। দোষ তোমার শিক্ষার, দোষ তোমার আবেষ্টনীর। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি সিঁড়ি তুমি অতিক্রম কোরেছ, তবু বিশ্ববিদ্যালয় তোমাকে কোন দিন দেশের দিকে তাকাবার শিক্ষা দেয়নি। তাছাড়া যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তুমি মানুষ হয়েছ সেই পারিপার্শ্বিক সাধ্যমত দেশের লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত নরনারীর সম্পর্ক থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। দেশে থেকেও তোমরা দেশের নও। তোমাদের এই অদ্ভুত সমাজে অর্থাৎ সোসাইটিতে এসে আজ আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। আমি আজ হাঁপিয়ে উঠেছি। আমায় তুমি মুক্তি দাও, সুমিত্রা। আমায়...

সুমিত্রা আর্তস্বরে বোলে ওঠে—

মুক্তি!

হাঁ। শিবশংকর আবেগের স্বরে বলে—ফেরার পথ এখনও রুদ্ধ হয় নি। এখনও সময় আছে সুমিত্রা।

একটা উদগত অশ্রু গোপন করবার জন্য সুমিত্রা মুখ নিচু করে।

'আজাদী ফৌজকে ছোড় দেও!'

'ইনক্লাব জিন্দাবাদ!'

'ইংরাজ ভারত ছোড়কে ভাগো।'

—গগনভেদী চীৎকার কোরতে কোরতে আসছে এক বিরাট্ মিছিল। সম্মুখে কংগ্রেস পতাকা এবং মুসলিম লীগ পতাকা একত্র গ্রথিত। মিল হয়েছে। মরণ তরঙ্গে সাঁতার দেবার জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে মিল হয়েছে।

আশ্চর্য! হিন্দু-মুসলমানে মিলন যে হয়ে যায়! সরকারের সঙ্গে নেতাদেরও যে মাথায় হাত! দলের মাথাদের মধ্যে মত-বিরোধ হয়। একজন ব'লে, সংগ্রামের মধ্যে মিল হোচ্ছে, তখন হোক। যুদ্ধশেষ নিজেদের মধ্যে আলোচনা কোরলেই হবে। অপর জন বলে, তার চেয়ে আগে আলোচনা কোরে পরে সংগ্রাম করাই উচিত নয় কি? বড় বড় কূটতর্ক নিয়ে থাকুন বিভিন্ন দলের নেতারা। জনসমাজ রাজনীতি বোঝে না, ভাগাভাগির আলোচনাও বোঝে না—জানে শুধু সংগ্রাম, তাদের শুধু মুখে এক কথা—কোরবো বা মরবো!

শিবশংকর দ্রুতগতিতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। ব্যস্ত হয়ে সুমিত্রা বলে—

একি! কোথায় যাচ্ছ?

মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার দাবী জানাতে।

জনতার মধ্যে শিবশংকর মিশে যায়। সুমিত্রা স্থাণুর মত চুপ কোরে বসে থাকে। বুদ্ধির সাথে তার বাক্ পর্যন্ত লোপ পেল নাকি?

বেলা বেড়ে গিয়ে ক্রমে পড়ে এল। মাঝে দুবার বেয়ারা এসেছিল সুমিত্রার ধ্যান ভাঙাতে। কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে হতাশ হয়ে চলে গেছে। তৃতীয় বার আর আসতে তার সাহস হয়নি। সন্ধ্যা ক্রমে গাঢ় হয়ে রাত্রে পরিণত হয়। কিন্তু শিবশংকর কৈ? রাত্রি আরও ঘন হয়ে আসে। বিক্ষুব্ধ নগরীও প্রায় শান্ত হয়ে আসে। চাকরেরা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। এখনও ত শিবশংকর এল না।

কি তীব্র ভাবেই না ইলেকট্রিক আলোটা জ্বলছে! অসহ্য গরমে সুমিত্রার সর্বাঙ্গ জ্বালা করে—কিন্তু ওঠবার উপায় সুমিত্রার নেই। তাকে যেন আষ্ঠে পৃষ্ঠে সোফার সঙ্গে বেঁধে রেখে দিয়েছে! বনের পাখী বনে উড়ে গেছে। সোনার খাঁচায় বদ্ধ পাখী সে। বদ্ধ দশাই তার কাছে শান্তি, তৃপ্তি। কাজ কি ঝড়-ঝঞ্ঝায় পূর্ণ বনের পথ!

ঝন্ ঝন কোরে টেলিফোন বেজে ওঠে। বহুকষ্টে সুমিত্রা হাতলটা তুলে নেয়। স্বপ্নের মত কথাগুলো ওর কাণে যায়। রিসিভারটা ক্লান্তভাবে নামিয়ে দেয় ও। ক্যাম্বেল হাসপাতালে শিবশংকর—আহত। এই কিছু আগে তার জ্ঞান ফিরেছে। সুমিত্রার কি সেখানে যাওয়া উচিত? শিবশংকর সুমিত্রার কাছে চেয়েছিল মুক্তি। যাক যে গেছে যাক। কাজ কি তার জীবনের আদর্শের পথে অন্তরায় হয়ে! কিন্তু সুমিত্রা ত শিবশংকরকে খোলা মনে মুক্তি দিতে পারেনি।—মুখ ফুটে ও বোলতে পারেনি যে, 'আমি তোমার চলার পথ হোতে সরে দাঁড়ালাম।'—হাঁ, সে এখনই হাসপাতালে গিয়ে বোলে আসবে—'তোমায় আমি মুক্তি দিলাম।'

একদমে যেন সুমিত্রা হাসপাতালে চলে আসে। একটি ছোকরা ডাক্তার এগিয়ে আসে।—কাকে খুঁজছেন? ও উদীয়মান অভিনেতা শিবশংকর বাবুকে। আসুন আমার সঙ্গে।

বিছানার কাছে ডাক্তারটি সুমিত্রাকে নিয়ে যায়। শিবশংকর ওপাশ ফিরে শুয়েছিল। বোধহয় তখনও তার বেশ স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে আসেনি।

মনে হচ্ছে, আপনি শিবশংকর বাবুর স্ত্রী।—ডাক্তারটি বলে। অভিনেতাদের মধ্যে আপনার স্বামীই বোধ হয় প্রথম দেশের ডাকে সাড়া দিলেন। নিজের বুকের রক্ত দিয়ে আজ তিনি প্রমাণ কোরেছেন যে, তারকবাবুর বইয়ে তিনি যা অভিনয় কোরেছেন তা সফল কোরতে তিনি পেছপাও নন।

সুমিত্রা বোলতে যাচ্ছিল—অভিনেতা ওঁর আসল পরিচয় নয়। উনি অভিনেতা নন—নন।

নমস্কার, আমি চলি। ডাক্তারটি চলে যায়। তার কি দাঁড়াবার সময় আছে—অনবরত যে হত—আহত লোক আসছে।

শিবশংকর এ দিক্ ফিরে তাকাতেই সুমিত্রার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়। এক নিঃশ্বাসে সুমিত্রা বলে ফেলে—

তোমায় আমি মুক্তি দিলাম। তোমার পথের ভার হোয়ে অন্তরায় হোতে চাই না।

শিবশংকর অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলে—তোমাকেও আমি মুক্ত কোরে নিয়ে যাবো। তুমি আমার পথের ভার না হোয়ে হবে সঙ্গী—অন্তরায় না হোয়ে হবে অন্তরঙ্গ।

সে কি আমি পারবো?

পারবে, সুমিত্রা, পারবে তোমার মধ্যে যে নির্ভীকতা আছে তা আমি জানি। আমি ঠিক কোরেছি, সুমিত্রা, ফিরে যাবো আমরা দুজনে সেই পরিত্যক্ত গেঁয়ো বাড়ীতে—পল্লীমায়ের বুকে। কংগ্রেসের বাণী প্রচার কোরবো—সংগঠন কোরবো গ্রামকে—নোতুন আলোয় উদ্ভাসিত কোরবো গ্রামবাসীদের। প্রকাশ্যভাবে জনসাধারণের মাঝে হয়ে যাবো বিলীন। এই আমার কর্ম—এই আমার ধর্ম।

তবে আজ সারাদিন আমাকে এত কষ্ট দিলে কেন?—তোমার ধর্ম সফল করবার জন্যই না আমি তোমার সহধর্মিণী হয়েছি।

আমার ভুল মার্জনা করো, সুমিত্রা। বিশ্বের সিংহাসনে আজ ভারত একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার কোরেছে। অভিষেক আরম্ভ হোতে আর অধিক দেরি নেই। ভারতমাতার অভিষেক যাতে সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে সফল হয়, চলো সেই উদ্দেশ্যে ভারতের প্রাণস্বরূপ পল্লীর বুকে গিয়ে উৎসবের আয়োজনে মেতে উঠি।

বন্দে মাতরম্।

প্রশস্ত একটা লম্বা ঘর। ঘরের মধ্যস্থলে রয়েছে একটা ছোট

প্রিন্টিং মেসিন ও আর আনুসঙ্গিক দ্রব্য সকল। ঘরের একপাশে একটা ছেঁড়া সতরঞ্চির ওপর বসে কতকগুলি পুরুষ ও রমণী কথা কইছে। এধারটা অন্ধকার। ঘরের ওধারে একটা মোমবাতি জ্বেলে ময়লা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে বুকের তলায় একটা বালিশ দিয়ে তারক আপন মনে লিখে চলেছিল। ওধারে অতগুলো মানুষের উপস্থিতি ও কথাবার্তা, তারকের মনোনিবেশ ভাঙতে পারছিল না। একটি মেয়ে ও একটি পুরুষ তারকের কাছে এগিয়ে আসে। মেয়েটি তারককে প্রশ্ন করে—কি এত মনোযোগ দিয়ে লিখছেন?

চমকে উঠে তারক বলে—অ্যাঁ—আমায় বলছেন?

হ্যাঁ, কি লিখছেন?

ইতিহাস।

আশ্চর্য হয়ে মেয়েটি বলে—ইতিহাস!

হ্যাঁ, কমরেড। তারক বলে—জাতি উত্থান পতনের কথা; জাতির সমাজের, রাষ্ট্রের, সভ্যতার ইতিহাস আমি লিখছি—বর্তমানের জন্যও বটে এবং ভাবী কালের জন্যও। কতকগুলো খৃষ্টাব্দের অনুসরণ কোরে, কতকগুলো রাজার সাম্রাজ্য বিস্তার কিংবা পতনের কথাটাই ইতিহাস নয়। আসল ইতিহাস হচ্ছে যুগে যুগে ধর্ম, সমাজ, ব্যবস্থার মানুষের সত্যরূপের কথা। ঐতিহাসিক আমি তাঁদেরই বোলবো যাঁরা এইসব কথাই লিখে গেছেন বা লিখছেন, যেমন বাল্মীকি বেদব্যাস, কালিদাস, বঙ্কিম...

বুঝলাম আপনার কথা। মেয়েটি বলে—আসুন, এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

তারক তাকিয়ে দেখে, সামনে দীর্ঘদেহ, জটাজুট শ্মশ্রুধারী এক সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান। সর্বাঙ্গ উন্মুক্ত—পরনে কেবল ব্যাঘ্রচর্ম।

মেয়েটি বলে—ইনি হোচ্ছেন তারকবাবু, একজন সাহিত্যিক এবং আমাদের দলের প্রচার সচীব। আর ইনি হোচ্ছেন বিপ্লবী বীর ধূর্জটী-প্রসাদ সিংহ—ছ বছর কারাবাস করার পর পনের বছর পূর্বে জেলখানা থেকে পলায়ন কোরেছিলেন, উপস্থিত আসছেন তিব্বত থেকে।

তারক নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—বসুন। সন্ন্যাসী আসন গ্রহণ করেন।

তারক বলে—আপনি বলুন, আপনার জীবনের কাহিনী। আপনার রোমাঞ্চকর যাত্রাপথের ইতিহাস আমি লিপিবদ্ধ কোর্‌বো।

সে ইতিহাস ব্যর্থতার।

কিন্তু ঐ ব্যর্থতার মধ্য থেকেই আজ চরম স্বার্থকতা ফুটে উঠেছে!

হাঁ, এ কথা আমি স্বীকার করি। সন্ন্যাসী জলদগম্ভীর স্বরে বলেন—এই কদিন দেশে এসে আমি লক্ষ্য কোরেছি যে, আজ জাতির জীবনে এসেছে এক অভূতপূর্ব জাগরণ। তারকবাবু…

বাবু বোলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। তারক গদ্‌গদ স্বরে বলে—আমাদের এই জয়যাত্রার পথের আপনারাই হোচ্ছেন পথ প্রদর্শক, গুরু।

ভাই তারক। তোমাদের এই আন্তরিকতা, এই একাগ্রতা দেখে আজ আমার আশা হোচ্ছে ভারতের স্বাধীনতার যে স্বপ্ন একদিন আমরা দেখেছিলাম তা সফল হবেই। বন্ধু, ব্যর্থ আমরা হয়েছিলাম সত্য, কিন্তু পরাজয় আমরা স্বীকার করিনি—তার জ্বলন্ত প্রমাণ তোমরা। সিপাহী বিদ্রোহের পর সম্ভবত আমরাই আবার স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি এবং তা বাস্তবে পরিণত কোরতে গিয়ে বৃটিশ সরকারের প্রতি আঘাত হানি। সরকার ভয় পেয়ে আমাদের নাম দেন সন্ত্রাসবাদী। ধনীরা আমাদের নাম দেয় স্বদেশী ডাকাত। কিন্তু আমাদের বিফল হোতে হোলো কেন জানো—ঐ মিরজাফরের বংশধরদের জন্য। ধরা পড়লাম আমরা। কারুর হোলো ফাঁসী, কারুর হোলো কারাদণ্ড। কারুকে যেতে হোলো কালাপানি পার, আর কতক বা হোলো পলাতক।

ছ বছর আমি জেল খেটেছি। সে অত্যাচার তোমরা কল্পনা কোরতে পারবে না। সহ্য কোরতে না পেরে কেউ হয়ে গেল পাগল, কেউ আত্মহত্যা কোরলো, কেউ সরকারকে ভেতরের কথা জানিয়ে দিলো। আমরা কয়েকজন ঠিক কোরলাম পালাবো। প্রথমবার চেষ্টা কোরলাম ধরা পড়লাম। অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। আমাদের কড়া

পাহারায় রাখা হোলো। তারপর একটি এল সুযোগ। অপর জেল-খানায় স্থানান্তরিত করবার জন্য আমাদের নিয়ে যাওয়া হোচ্ছিলো ট্রেনে কোরে। আমরা তখন মরিয়া। দলে ছিলাম চারজন। অতর্কিতে আমরা চারজন রক্ষীর গলা টিপে ধরলাম। অজ্ঞান হয়ে তারা পড়ে গেল। চলন্ত ট্রেণ থেকে আমরা চম্পট দিলাম। পালিয়ে এসেও আমরা পড়লাম বিপদে। কেউ ভয়ে আমাদের আশ্রয় দিতে চায় না। এক আত্মীয় দিল আশ্রয়। কিন্তু টাকার লোভে পুলিসে খবর দিল। পুলিস এল। মাত্র আমরা দুজনে পালাতে পারলাম। বাকি দুজনের একজন ধরা পড়লো, অপর জন গুলির আঘাতে নিহত হোলো।

সন্ন্যাসী ক্ষণেকের তরে থামলেন। অতীত দিনের সঙ্গীদের কথা বোধহয় মনে পড়ে। তিনি আবার বোলতে থাকেন—

মনের মধ্যে এল আমাদের দুজনের প্রচণ্ড ক্ষোভ। দেশ স্বাধীন হোলে কি আমরা একাই সুখভোগ কোরবো? আমরা বদমাইস, দস্যু, ডাকাত। শিক্ষিতেরা উপহাস কোরে বোললো—আমরা দুটো সাহেব মেরে আর গোটা কয়েক পট্‌কা ফুটিয়ে দেশ উদ্ধার কোরতে চেয়েছিলাম। কেউ আমাদের বুঝলো না—জানলো না—আমাদের ডাকে সাড়া দিল না। আমরাও চেয়েছিলাম ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিপ্লবের আগুন জ্বালতে। বেইমানি আর সহযোগিতার অভাবে আমরা ব্যর্থ হোলাম। বুঝলাম, আমাদের কোথাও ভুল হোয়েছে। দেশ-জননীর শৃঙ্খল মুক্ত হোতে দেরি আছে। ভগবানের আবির্ভাবের সময় এখনও হয়নি—ভগবান্ জাগেন নি।—

চলে গেলাম তিব্বত। দুর্গম পর্বতে আমরা দুজনে বাস কোরতে লাগলাম একদল লামার সঙ্গে। বৎসরের পর বৎসর কেটে যেতে লাগলো ধীরে ধীরে; ভুলে যেতে লাগলাম জন্মভূমির কথা; আমাদের অতীত গাঢ় অন্ধকারে মিশে গেল। গত বৎসর মারা গেল আমার সেই দুর্দিনের একমাত্র বন্ধু। নিজেকে বড় একা একা বোধ কোরতে

লাগলাম। কিছুই আর ভাল লাগে না। দেশের কথা সর্বদা মনে পড়তে লাগলো—ফিরে এলাম দেশে।

এসে দেখি, চারদিকে কত পরিবর্তন। পুরনো দিনের আর কেউ নেই। যারা আছে তারা না থাকারই সামিল। সেদিন লক্ষ্য কোরলাম পুলিস অনুসরণ কোরছে। হয়ত আমাকে সন্দেহ কোরেছে, হয়ত আমার নামের পরোয়ানা আজও বহাল আছে। কাজ কি, বাকি কটা দিন কারাগারে কাটিয়ে? জন্মভূমিকে প্রণাম কোরে অধম সন্তান বিদায় চেয়ে নিলো। হঠাৎ পথে দেখা অবনীর সঙ্গে—তোমাদের বড়দার সঙ্গে। আমাদের দলের ওই ছিল সব চাইতে ছোট। ওকে আমরা সবাই খুব স্নেহ কোরতাম। আমি ওকে প্রথমে চিনতে পারিনি। কিন্তু ও ঠিক চিনেছে আমাকে এই দীর্ঘ দিনের পরও। বোললো—তোমায় ছাড়ছি না, ধূর্জটিদা। আমি এখনি পাঞ্জাবে যাচ্ছি। এই ঠিকানায় এই চিঠি নিয়ে তুমি যাও। তোমার মত লোকের আজ দরকার।

তারক বলে—সত্যই আপনাকে পেয়ে আমরা খুব লাভবান। আপনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।

সন্ন্যাসী বলে—সে ধৃষ্টতা আমার নেই, ভাই। আজ নোতুন মত, নোতুন ভাবধারায় তোমরা এগিয়ে চলেছো। এর সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই। তোমরাই আজ আমাকে পথ দেখাবে। একটা নোতুন কথা শুনলাম, একদল নাকি ভারতকে ভাগ কোরতে চায়। এর কারণ কি? আর কি ভাবেই বা কোরতে চায়? 'পাকিস্থান' কথার মানে কি?

তারক বলে—আপনার প্রশ্নের কোনটারই উত্তর দিতে আমি পারবো না। যাঁরা পাকিস্থান চান তাঁরাও এ সমস্ত কথার উত্তর দিতে নারাজ।

সে কি? উদ্ভট একটা হেঁয়ালির জন্য কেন এই মাতামাতি! ভারতের স্বাধীনতার পথে এরা যে বিঘ্নস্বরূপ হোয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমার মনে হয় সরকারের কারসাজি আছে এর মধ্যে।

আরও একটা আশ্চর্য্য কথা আছে।—তারক বলে—আধুনিক যুগের দাবীর ওপর ভিত্তি কোরে রাশিয়ার সাম্যবাদের আদর্শে আমাদের

দেশে একটি দলের সৃষ্টি হোয়েছে—তারাও ভারত বিচ্ছেদ সমর্থন করে।

তাতে সাম্যবাদের কি সুবিধা?

তা আমি বুঝি না। তবে সাম্রাজ্যবাদ কায়েম হবার যে সুবিধা হবে, এটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারি।

ঘরের মোমবাতিটা এতক্ষণে সকলের অগোচরে নিঃশেষ হয়ে এসেছিল, হঠাৎ নিভে গেল।

শান্তিদেব বই পড়ছিল, রমা ঘরে প্রবেশ কোরে জিজ্ঞাসা করে—কখন এলে? বই থেকে মুখ তুলে শান্তিদেব উত্তর দেয়—এই একটু আগে, কিন্তু তোমাকে ত ভেতরে দেখতে পেলাম না।

বৌদির সঙ্গে দেখা কোরতে গেছলাম।

কেমন আছে? আমি আর সময় কোরে যেতে পারি না। বড় কাজ পড়েছে।

আগে ত রোজই প্রায় সময় হোতো?

দেখ, তুমি যা মনে কোরে কথাটা বোললে তা ঠিক নয়। সত্যিই আজকাল বড় কাজ। তা তুমি ত নিজেই দেখতে পাচ্ছো। জীবনে এত কাজ আমি কখনও করিনি।

তা হোলেও সময় কোরে মাঝে মাঝে যেতে হয়। আমারই কি কাজটা কম? তাছাড়া বৌদির অবস্থাটা একবার ভেবে দেখো। অত বড় বাড়ীতে একা থাকে—অবশ্য বামুণপিসী আর রামুও আছে।

রামু লোকটা বেশ। সেদিন আমার কাছে তারকদার কথা বোলতে বোলতে কেঁদে ফেলেছিল। তারকদাকে রামু সত্যিই ভালবাসে।

এই এতটুকু বেলা থেকে দাদাকে ও মানুষ কোরেছে। ছেলে বেলায় দাদা যা দুষ্টু ছিল তা তোমায় কি বোলবো। একদিন কি কোরেছে জানো—ওকি আমার দিকে অমন একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছো কেন?

শান্তিদেব বিজ্ঞের মত বলে—ভাবছি, তারকদার ছেলেবেলায় তুমি কত বড় ছিলে।

রমা বলে—দুষ্টুমি করিও না। রামুর নিকট এই সকল কথা আমি যে শুনিয়াছি তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? যাও তোমার সহিত আর কথা কহিব না।

শুদ্ধ ভাষায় কথা বলো ক্ষতি নেই। কিন্তু কথা বন্ধ কোরোনা। লক্ষ্মীটি।—শান্তিদেব অনুনয়ের ভঙ্গীতে রমার হাত ধরে। বাইরে নকল কাশির শব্দ শোনা যায়। শান্তিদেব হেসে বলে—আয় শের আলি। অপ্রস্তুতের নত শের আলি ঘরে ঢুকে বলে—অসময়ে এসে বিরক্ত কোরলাম। এখন যাই, পরে আবার আসবো।

শান্তিদেব বলে—বসো, বসো। আর ইয়ারকি কোরতে হবে না। এস, তোমাদের দুজনের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি হোচ্ছেন···

থামো—রমা বলে—তোমার কথার মধ্যেই ওঁর পরিচয় আমি পেয়েছি। আর আশা করি উনিও আমার পরিচয় বুঝতে পেরেছেন। নয় কি আলি সাহেব?

নিশ্চয়ই।

তোমরা গল্প করো, আমি আসছি বলে রমা চলে যায়।

শান্তিদেব বলে—তারপর, কি খবর আলি ভাই?

খবর আর কি। হাতে কোন কাজকর্ম ছিল না তাই চলে এলাম।

আমিনার খবর কিছু জানিস?

না ভাই। দেখ এসব নভেলী প্রেম-ট্রেম আমি বুঝি না।

তবে ভাবীর সঙ্গে···

আরে সে আলাদা কথা। স্বামী স্ত্রীতে ভালবাসা হবে না?

তুমি একটি ধর্মভীরু মুসলমান!

যা তা বোলেছিস ভাই। ধর্মই আমার কাছে সব। আমার নিজের ধর্মের জন্য আমি সব কিছু কোরতে পারি।

তাই বোলছি আলি ভাই, তোমার মুসলীম লীগে যাওয়া উচিত ছিল।

হেসে শের আলি বলে—সেখানে আমার মত গোঁড়া মুসলমানের স্থান নেই। ও সব বাজে কথা যেতে দাও। সংগ্রাম আরম্ভের আর কত দেরি?

এত ব্যস্ত হোচ্ছ কেন, বন্ধু?

তুমি বুঝতে পারছো না আমার মনের অবস্থা। ভারতের নানা-স্থানের সাম্প্রতিক বিক্ষোভ, বোম্বাই, করাচির নাবিক বিদ্রোহ, কয়েক স্থানের সিপাহীদের ধর্মঘট আমাদের বারে বারে দিচ্ছে বজ্রের সঙ্কেত। এ সময় নির্বাচন নিয়ে মাতামাতি ভাল লাগছে না।

শান্তিদেব বলে— উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে, আর দেশ আজ জেগেছে তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তুমি ত জানো, কেন আজ আমাদের এই শান্তভাব ধারণ কোরতে হোচ্ছে।

তোমাদের কংগ্রেস যদি আহ্বান না করে।

তোমাদের কংগ্রেস বোলো না—কংগ্রেস কারু ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর মূর্তিমান জাগ্রত প্রতিষ্ঠান এই কংগ্রেস। পৃথিবীর সব কিছু অন্যায়ের প্রতিবাদী এই কংগ্রেস। তাছাড়া তুমি ত কংগ্রেসের একজন সভ্য, একজন উৎসাহী সংগঠনকারী কর্মী।

শের আলি কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকে। শান্তিদেব বলে—

কি ভাবছিস?

দেশের কথা। আবার আসছে দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে হিন্দুস্থানের সুদূর পল্লী হোতে। কিন্তু লোকে এবার আর নিঝুম হয়ে পথের দুধারে মরবে না। মরবার আগে সবাই একবার জ্বলে উঠবে। তামাম হিন্দুস্থানব্যাপী উঠবে আগুন জ্বলে। বিপ্লব-চাই! বিপ্লব চাই!—প্রচণ্ডবেগে শের আলি টেবিলের ওপর মুষ্টাঘাত করে।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ কোরছিলো রমা। চমকে ওঠায় পেয়ালা থেকে খানিকটা চা মাটিতে পড়ে যায়।

রমা বলে—ওঃ! মারামারি কোরছো নাকি?

শের আলি লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করে।

নিন, চা খান বোলে রমা চায়ের পেয়ালা এগিয়ে ধরে। তারপর মিটিমিটি হেসে শের আলিকে জিজ্ঞাসা করে—

বাড়ীতেও এই রকম করেন ত?

হেসে শের আলি বলে—

সব সময়। আমার চেয়ে ওই বেশি করে।

শান্তিদেব বলে—জানো, রমা, তিনি এঁর ওপর যান। একদিন কি হয়েছিল জানো?

উৎসুক ভাবে রমা বলে—কি?

আমাদের ঠিক উলটো ছিল ওদের দুজনের ব্যবহার।

সে আবার কি?

এই তোমাতে আমাতে যেমন ছিল, বিয়ের আগে খুব ভাব। ওদের দুজনের ছিল তেমনি ঝগড়া। একদিন আমি আর আলি ভাই ফিরছি স্কুল থেকে পথে দেখি, আলি ভায়ের বাগানে আমগাছে উনি বসে। শের আলি ত দেখেই রেগে আগুন। গাছতলায় গিয়ে শের আলি বলে, 'নেমে আয় বদ্‌মাস্। আজ তোর একদিন কি আমারই একদিন।' গাছের ওপর থেকে ও বলে, 'তোর গাছ নাকি?'

'হাঁ, আমার গাছ।'

'তোর, না হাতী!'

'দাঁড়া দেখাচ্ছি তোর মজা।'

শের আলি গাছে উঠে ওকে ধরতে যায়। যেই কাছ বরাবর গেছে অমনি আচমকা শের আলিকে ঠেলে ফেলে দেয় ও। শের আলিও ওমনি পড়বি ত পড় একেবারে আমার ঘাড়ে। হুড়মুড় কোরে আমরা দুজনে মুখথুবড়ে পপাত ধরণী তলে। ভাগ্যিস বেশি ওপর থেকে শের আলি পড়েনি। গাছের ওপর থেকে ওর সে কি হাসি। কিন্তু তখনও ওর হাত থেকে নিস্তার নেই! পটাপট গাছ থেকে আম ছোঁড়ে আর আমাদের ছুঁড়ে মারে। আমরা ত বইপত্তর ফেলে কোন রকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পড়ি কি মরি কোরে ছুটে পালাই! এমন কত…

রমা হাসতে হাসতে বলে—যাক, এখন ত আর ঝগড়াঝাটি হয় না?

শান্তিদেব বলে—হয়, তবে অন্য ব্যাপার নিয়ে—কে কাকে বেশি ভালবাসে এই নিয়ে!

শের আলি বলে—আমাকে একা বাড়ীর মধ্যে পেয়ে খুব বোলে নিচ্ছ। আচ্ছা, আমার বাড়ীতেও তোমাকে যেতে হবে।

আমি ভয় করি না। কেন না ভাবী ত আজকাল আর সামনে বার হয় না। সত্যিই, এ আবরুর মানে হয় না। সাদির আগেতে আমাদের সামনে মারামারি লাফালাফি সবই হোতো—বিয়ে কোরেই পর্দার ভেতর ঢুকে জেনানা হয়েছে।

শের আলি বলে—এই কুসংস্কারগুলো ঘুচোতেই হবে। আচ্ছা, এইবার গিয়ে দেখো।

সামনে এসে চা দেবে?

চা ত কি—মাথায় জল ঢেলে দেবে।

শান্তিদেব বলে—তবে দরকার নেই, ভাই। বেশ আছি।

রমা বলে—এই যা! একটা কথা বোলতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিলাম—বাইরের দাওয়ায় একটা লোক শুয়ে আছে। বোধহয় কোন রোগ হয়েছে।

শান্তিদেব বলে, আমাদের ডাক্তার খানায় যেতে বোললে না কেন?

যাবার মত তার অবস্থা নয়।

শের আলি বলে—আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি।

তুমি বসো। শান্তিদেব বলে—চটকোরে আমি ডাক্তার খানায় দিয়ে আসছি?

শান্তিদেব ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বার হয়ে যায়।

কি হয়েছে তোমার? শান্তিদেব বাইরে এসে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে। লোকটা পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে বিড়বিড় কোরে কি যেন বলে। শান্তিদেব বুঝতে পারে, লোকটির প্রবল জ্বর এসেছে। সে লোকটিকে ঘাড়ের ওপর তুলে নেয়। লোকটি শান্তিদেবের মুখের পানে তাকায়। জামা

কাপড় পরা এ কেমন ভদ্রলোক। সে একটু বিব্রত বোধ করে। কিন্তু তা প্রকাশ করবার মত ক্ষমতা তার নেই।

ডাক্তারবাবু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন—একি! শান্তিবাবু, আপনি নিজে আবার কষ্ট কোরে নিয়ে এলেন কেন? আমাদের খবর দিলেই হোতো।

শান্তিদেব বলে—এর চিকিৎসার বন্দোবস্ত একটু তাড়াতাড়ি করুন। মনে হয়, না খাওয়ার জন্যই লোকটির অবস্থা এই রকম হয়েছে।

ডাক্তারবাবু ব্যস্তভাবে লোকটিকে পরীক্ষা কোরতে থাকেন।

আপনার অনুমানই ঠিক শান্তিদেববাবু; খেতে না পাওয়াই এ রোগের কারণ। লোকটির বাড়ী কাছাকাছি কোথাও নয় বোলেই মনে হোচ্ছে, আগে ত কখন দেখিনি।

শান্তিদেব বলে, অন্য জায়গার লোক, পেটের দায়ে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়েছে বোলেই মনে হয়। আচ্ছা, আসি।

শান্তিদেব বাড়ী ফিরে আসে। ঘরে ঢুকে বলে—তোমরা দুজনে দেখছি বেশ আসর জমিয়ে তুলেছ।

রমা বলে—উনি এতক্ষণ আমাকে বোঝাচ্ছিলেন যে, দেশের কাজই জীবনের সব চাইতে বড় কাজ—বিশেষত আমাদের মত পরাধীন জাতির।

শান্তিদেব একমুখ হেসে বলে—

দেশ দেশ কোরে এইবার দেখছি আলি ভাই ক্ষেপে যাবে।

শের আলি বলে—তুমিও আমার চেয়ে কম ক্ষ্যাপা নও।

রমা বলে—আরে, আকাশে বেশ মেঘ কোরেছে।

আর জল হয়ে কি হবে। শের আলি বলে। আসল সময়েই বৃষ্টি নাবলো না। উঠি ভাই, আজ।

শান্তিদেব বলে,—এখন কোথায় যাবে—এখনই বৃষ্টি এসে যাবে।

আসুক গে।

প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি নেমে আসে।

রমা বলে—বোলতে বোলতেই বৃষ্টি নেমে এল।

হঁ, ভাই। শের আলি উঠে দাঁড়ায়।

রমা বলে—এই ভীষণ বৃষ্টিতে অত দূর গেলে নিশ্চয় ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

এ শরীরে ঠাণ্ডা লাগে না।

রমা শের আলির শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখে। হাঁ শরীর বটে। লম্বা চওড়া পেশীবহুল বলিষ্ঠ গঠন। বুকের বোতাম নেই তাই দৃঢ় পেশী সঙ্কুল বক্ষঃস্থল স্পষ্ট দেখা যায়।

রমা বলে—আপনি বুঝি নিয়মিত ব্যায়াম করেন?

না—ওসব আমার ধাতে সয় না।

শান্তিদেব বলে—তা সইবে কেন? তুমি যে একটি মূর্তিমান অনিয়ম! —একটু পরে বৃষ্টিটা একটু কমলে যেও।

দূর আমায় কি ছেলে মানুষ পেয়েছিস?

তাহলে একটা ছাতা নিয়ে যান—রমা বলে।

কোন প্রয়োজন নেই, ভাবী। আমার বুকের ভেতর অনবরত যে আগুন জ্বলছে সে আগুনে পড়ে এই দুফোঁটা বৃষ্টির জল বাষ্প হয়ে আবার বাতাসে মিলিয়ে যাবে। জয় হিন্দ।

জয় হিন্দ। শান্তিদেব বলে—একটা জ্বলন্ত-অগ্নিশিখা!

তারক এধার ওধার-হাতড়ে একটা বাতি খোঁজে, কিন্তু পায় না। সে বাইরে যাবার জন্য উঠে পড়ে। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে—

কোথায় যাচ্ছেন?

গোটা কয়েক বাতি কিনে আনি।

হাঙ্গামার জন্যত সব দোকান বন্ধ।

দেখি, চেষ্টা কোরে।

তারক বাইরে বেরিয়ে পড়ে। অনেক খোঁজা খুঁজির পর বহুকষ্টে

একটা ছোট দোকান হোতে তারক কয়েকটি বাত্তি পায়। রাত্ত বেশি হয়নি, তবু এরই মধ্যে নগরী কেমন যেন একটু নীরব আতঙ্কগ্রস্ত মনে হয়। দু'একজন পথিক যারা পথ দিয়ে চলাচল কোরছে, তাদের মুখ দেখে বোঝা যায় যে, বেশ ভয়ে ভয়ে এধার-ওধার তাকাতে তাকাতে চলেছে। কিছুই বলা যায় না—হয়ত এখনই একদল সৈন্য এসে দমদম গুলি চালাতে আরম্ভ কোরবে। দূরে বহু মানুষের কণ্ঠধ্বনি শোনা যায়। আসছে কোন মিছিল। গোটা কয়েক উজ্জ্বল আলো নিয়ে এসে পড়লো এক বিরাট শোকযাত্রা। পুরোভাগে বহুজনের স্কন্দের ওপর নিদ্রিত রয়েছে এক বীর শহীদ। সর্বাঙ্গ তার পুষ্পে ভরে গেছে। পথের দুধারে সমস্ত বাড়ীর দরজা জানালা খুলে গেল। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি বীর শহীদের অমর যাত্রাপথের মঙ্গল কামনা করতে লাগলো।

একটা লম্বা রক্তবর্ণ কাপড়ে তুলোর বড় বড় হরপে লেখা—শহীদ বিষ্ণুপদ দত্ত।—জিন্দাবাদ।

তারক চমকে ওঠে। কে এই বিষ্ণুপদ আমাদের বিষ্টু নয়ত। বহুকষ্টে তারক শবদেহের কাছে এগিয়ে যায়। সেই নবীন কোমল হাস্যোৎফুল্ল মুখ! এ মুখ কি ভোলবার!...তারকের চোখ বেয়ে হু হু কোরে জল নেমে আসে। তারক কাঁদছে! এত দুর্বল সে? চোখের জল মুছে তারক সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে বিষ্টু! এত আনন্দের কথা—উল্লাসের কথা। দুফোঁটা চোখের জল ফেলে অমর আত্মার অমঙ্গল করতে নেই। জনতা তখন চীৎকার কোরতে কোরতে এগিয়ে চলেছিল—

—বন্দেমাতরম্।

ইন কিলাপ জিন্দাবাদ।

রক্তের বদলে রক্ত চাই।

ঘরে এসে তারক বিছানায় শুয়ে পড়ে। অন্ধকার ঘর। কোথা থেকে একটা আলোর রেখা এসে ঘরের মধ্যে পড়ে। আবছা অন্ধকারে তারক বেশ দেখতে পায় একটা মিছিল চলেছে ঐ আলোর রেখা লক্ষ্য কোরে।

কে তোমরা ? কোথায় চলেছ ?

মিছিলের মধ্যে দেখা যায় বিষ্টুর মুখ।

আশ্চর্য হোচ্ছ কেন, তারকদা। আমরা ত মরি না। আমরা যে রক্তবীজের বংশধর। আমাদের এক এক ফোঁটা রক্ত থেকে হাজার হাজার বীর সন্তান জন্মগ্রহণ কোরেছে। আমরা আনি রক্তের আহ্বান—মুক্তির উন্মাদনা। আমাদের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে আকাশে বাতাসে সর্বত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে, যুগে যুগে, অত্যাচার—অবিচারের প্রতিরোধের জন্য, মানুষের অভিশাপ মোচনের জন্য আমরাই জন্মগ্রহণ করি, তারকদা! আমরাই—

পরিত্রাণায় সাধূনাং
বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায়
সম্ভবামি যুগে যুগে ॥
মা ভৈঃ। জয় হিন্দ!

নিস্তব্ধ নিঝুম মহানগরী কোলকাতা। পথের লোক চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে বহু পূর্বেই। চারদিক্ গাঢ় অন্ধকার! সেই আঁধারে ছায়ার মত দুটো মূর্তি রাস্তার দুপাশের বাড়ীর দেয়ালে যেন কি কাগজ মারতে মারতে এগিয়ে চলেছিল। মোড়ের মাথায় একখানা কাগজ মেরে গলির মধ্যে ঢুকতেই প্রথম মূর্তির সঙ্গে সামনে থেকে অপর একটা মূর্তির ধাক্কা লেগে যায়। প্রথম মূর্তি একটু অপ্রস্তুত বোধ করে, কারণ দ্বিতীয় মূর্তিটিকে মেয়ে মানুষ মনে হয়।

তারক বলে—অন্ধকারে দেখতে পাইনি মাপ কোরবেন।

তারকের কথা শুনে সেই মূর্তি চমকে উঠে বিহ্বল ভাবে বলে—তারকদা!

অ্যাঁ, মালতী! এত রাত্রে কোথায় চলেছ ?

বৌদি কেমন আছেন ?

আমি জানি না।

ওঃ। তা এত রাত্রে কি কোরছো ?

দেয়ালে কাগজ অাঁটছি।• কিন্তু তোমার কথা ত বোললে না ?

শুনে তোমার লাভ ?

ক্ষতিও নেই।

যদি বলি ক্ষতি আছে।

তাতে আমি ভয় পাইনা। জীবনে অনেক ক্ষতি স্বীকার কোরেছি।

তাই নাকি ?

হাঁ।

তবে শোন।—মালতী বলে—ঘর, সংসার, স্বামী—সব কিছু ছেড়ে আমি পথে বার হোয়েছি।

তোমার বিয়ে হয়েছে ?

হোয়েছিলো। তবে···

তবে ?

আমি তা স্বীকার করি না। মালতী বেশ জোর দিয়ে বলে।

তারক জিজ্ঞাসা করে—কার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিলো ?

সেই মাতাল বুড়োটার সঙ্গে।

কিন্তু কাজটা কি তুমি ভাল কোরলে ?

তোমার মতো অনেকেই সমর্থন কোরবে না, তা আমি জানি। মালতী বোলতে থাকে—

ভালবাসা আমি চাই না। কিন্তু···আলো থাকলে আমি দেখাতাম আমার সর্বাঙ্গে অত্যাচারের চিহ্ন।

এই হঠকারিতার পরিণাম তুমি ত জানো।

একে হঠকারিতা বোলছ ! অথচ সিনেমার কিংবা কোন উপন্যাসের নায়িকা এই রকম কাজ কোরলে বাহবা দিয়ে তার সৎসাহসের গুণগান

কোরতে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সেই ঘটনা যখন সত্যই ঘটলো তখন ঘৃণায় নাক কুঁচকে দূরে সরে যাচ্ছো!

তারক অবাক্ হোয়ে যায় মালতীর কথাবার্তা শুনে। তারক ছাড়া অন্য একজন অপরিচিতের সামনে বেশ সপ্রতিভ ভাবে কথা কইছে মালতী। হঠাৎ তারকের মনে পড়ে যায় মায়ার কথা। মালতীও যদি···তারক বলে ওঠে—তুমি আসবে আমাদের দলে?

কি কাজ তোমাদের দলের?

নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত—বুভুক্ষু, মুমূর্ষু, ক্ষয়িষ্ণু মানুষের কাণে আমরা দিই জাগরণের ডাক—আশার বাণী।—এই আমাদের ব্রত।

দুজনেই নির্বাক্। অন্ধকারের গাম্ভীর্য আরো বেড়ে ওঠে!

তারকের সঙ্গী মৌনতা ভঙ্গ কোরে বলে—দূরে লাল পাগড়ীর সুমধুর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

তারক বলে—পারবে এই ব্রত গ্রহণ কোরতে?

পারবো।

অনেক দুঃখ, কষ্ট নির্যাতন সহ্য কোরতে হবে।

তাতে আমি ভয় পাই না।—মালতীর কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

তবে এস।

মালতীর একখানি হাত সবলে আক্রমণ কোরে তারক নগরীর গাঢ় অন্ধকারে মিশে যায়।